কাছিম

জীবন সরকার

অন্যদিন ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস কলকাতা ৪৫

প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৭২ অন্যদিন ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস্ কলকাতা ৪৫ থেকে শিশির ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন এবং সত্যনারায়ণ প্রেস ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন কলকাতা ৬ থেকে হরিপদ পাত্র ছেপেছেন। প্রচ্ছদ মুদ্রণ: ইম্প্রেশন হাউস ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা ৯। প্রচ্ছদ শিল্পী: গণেশ পাইন।

পরিবেশক: দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা ১২

মেজবৌদি—

আপনার দুঃখ আমার সাহিত্যের পাথেয়

সূচীপত্র

• কালো হাঁস

ধলেশ্বরী নদী,—পদ্মা-প্রমত্তা নয়; বুড়িগঙ্গাও নয়। যৌবন ছুঁই ছুঁই কুমারী মেয়ের মত ঢল-ঢল-ঢলানী অথচ সর্বনাশী নয়। বর্ষায় মহাসাগর আর চৈত্রে ইছামতী খাল,—মঙলির তাই মনে হয়। শুক্লপক্ষ না কৃষ্ণপক্ষ, নদীর ঢেউ দেখেই বলে দিতে পারে সে কেননা জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে যে একাত্মা এক প্রাণ। দিনরাত—রাতদিন একই সঙ্গে কেটেছে, বড় হয়েছে। সুখ-দুঃখ,—একে আর একে,—দুই-এ দুই-এ চার হয়েছে।

মঙলিদের বাড়ি নদী-লাগোয়া বলে ঝপ্-ঝপ্—ছপ্ছপ্ ঢেউ ভেঙে পড়ছে, ভাঙছে—যাচ্ছে। জলের ধাক্কায় পার ভেঙে নদী মাঠের ভিতর ঢুকছে। আর একটু ডানদিকে এগুলেই বাড়ি ভাঙতে আরম্ভ করবে। বাড়ির নামায় গাছ-গাছালির বন। মাঝে-মধ্যে সবরি কলার সারি। আশ-শ্যাওড়া, হিজলগাছও রয়েছে। গাছের গুঁড়ি কেটে কেটে সিঁড়ির মত করে ঘাট বানানো হয়েছে অবিশ্যি তা নদীর পার পর্যন্তই।

বর্ষাকাল, চারিদিকে শুধু জল আর জল। মাঠ-ঘাট-নদী জলে একাকার, যেন বিরাট সমুদ্র। মাঠে—সবুজ-সবুজ ধানগাছগুলি বাতাসে দুলছে—খেলছে। হিজল, জামগাছগুলি কোমর জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্নান করছে। কলমীলতা, হেলেঞ্চা, কচুরিপানা, শাপলা, বাড়ির কিনারে কিনারে ঝোপে-ঝাড়ে দল বেঁধে জটলা করছে।

মঙলি আঁতিপাতি করে খুঁজেও হাঁসগুলি দেখতে না পেয়ে ঘাটে এসে ডাকতে লাগল: আয় আয়—প্যাঁক-প্যাঁক। কাছে-পিঠে কোথাও দেখতে পেল না তবু। জল, বিল, জেলেডিঙি, কেরায়া নৌকা, গয়না, পালতোলা নৌকা দেখতে গেল। জল যেন অন্যান্যবারের

চেয়ে বেশী বাড়ছে,—জলের তোড় কত! দেখতে দেখতে আবার ডাকতে লাগল: প্যাক-প্যাক-প্যাক…। আয়…আয়…।

মঙলি হাঁসগুলিকে ভীষণ ভালবাসে। দিনে একবার না দেখলে ওর ভাল লাগে না। ডাকতে ডাকতে দূর থেকে শোনা গেল—প্যাক-প্যাক…। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ও। দিনকাল ভাল নয়, কখন বাজপাখিতে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে বলা যায় না। তাই বার বার ডেকে খোঁজ-খবর নেয়, আছে কি না! সাবধানের মার নেই! কখন কপালে কি ঘটে বলা যায় না,—মরালগুলি তো আর একস্থানে থাকে না। কতদিন বলেছে মঙলি দূরে যাবি না, কে কার কথা শোনে, নিজেকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। প্যাক-প্যাক শব্দ পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘাটের গুঁড়িতে বসে জলের নিচে পা ডুবিয়ে দিল মঙলি। আর পালতোলা নৌকাগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। কোথায় যায় নৌকাগুলি! কমলাঘাট না মারকাদিম। এইরকম নৌকায় চারুদিকে নিয়ে গিয়েছিল—ঠাকুরবাড়িতে পঞ্চাশ সালে; ওখানে বিয়ে দিয়েছিল। সাভার হয়ে যেতে হয়। জামাইবাবুর কি সুন্দর চেহারা! কার্তিকের লাগান। বিয়ের কথা মনে হতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। গায়ের রঙ কালো বলে কেউ পছন্দ করে না ওকে অথচ বাবা কত চেষ্টা করছেন। কত জায়গা থেকে সম্বন্ধ ঠিক করছেন কিন্তু কেউ পছন্দ করে না। সবাই নাক সিঁটকায়! ইমানগঞ্জ থেকে যারা এসেছিল তারা অবিশ্যি বলেছিল: মেয়ে কালো হলে কি হবে গড়ন ভালো, চোখমুখ সব কিছুই পরীর মতন।

আহা! বলার ঢঙ দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। এতই যখন বললি, পছন্দ হল না কেন? গায়ের রঙ কি ধুয়ে খাবি? কৃষ্ণ কি কালো ছিল না! পছন্দ হয় নি—বেশ না করে দাও। মনরক্ষা করবার জন্য ওসব কথা বলে দুঃখ বাড়িয়ে কি লাভ। আবার কেউ এলে কোনদিন সেজেগুজে যাবে না। কি হবে সেজেগুজে! কেউ তো পছন্দ করবে না। বাবা হয়তো রাগ করবেন, মা কাঁদবেন! বাড়ির বড়

মেয়ে এখনো বিয়ে দিতে পারছেন না। চিন্তায় চিন্তায় চোখে ঘুম নেই। বয়েস তো আর কম হল না। কৈশোর পেরিয়ে যৌবন ছুঁই-ছুঁই—ঢল-ঢল ধলেশ্বরী যেন। বাবার চোখে-মুখে চিন্তার প্রশ্নচিহ্ন। কোথায় দেবেন! ছেলে কেমন হবে সেই খোঁজ-খবর নিতে নিতে বাবার মাথার চুল সব পেকে গেল অথচ গত বর্ষায়ও বেশ কাঁচা চুল ছিল।

না—আর ভাববে না। মঙলির বিয়ে কথাটা যেন এই বাড়িটার গাছ-গাছালির ঝোপে, বন-বাদাড়ে, হিজল-জামগাছে সন্ সন্ বাতাসে ঘুরছে। ভাল লাগে না এই সব। বিয়ে না হলেই নয়? মরণকাকা তো বিয়ে করে নি, তার কি দিন যাচ্ছে না! সে যে পুরুষমানুষ; ওঃ পুরুষমানুষ বিয়ে না করলে দোষ নেই। মেয়েরা না করলেই—সমাজ, ধর্ম, জাত সব রসাতলে যাবে। অলক্ষ্মী মেয়ে। অসতী মেয়ে। কত কি উদাহরণ। আর পারি না বাপু সইতে। ইচ্ছে করে ধলেশ্বরীর জলে ডুব দিয়ে পাতালে চলে যাই। বাজপাখি কি ছোঁ মেরে নিতে পারে না? রঙ-বেরঙের কচি-কচি হাঁসগুলি নিয়ে কি হবে? বুঝেছি কালো মেয়ে পছন্দ নয়।

সেখান নগরের গয়না চলে গেল। আর বেলা নেই। সূর্য পশ্চিমদিকে হেলেছে। উঠতে হয়। দুধ নিয়ে যাচ্ছে ঢাকা শহরে। ওখানে নাকি মেয়েরা গেলে ঘর পায়। অনেক লোকে ভালবাসে, অনেক টাকা! যাবে নাকি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কি সব কথা ভাবছে। আর কক্ষণো ভাববে না। মুখে আনলেও পাপ! নদীর জল নিয়ে মাথায় ছিটা দিল। তাহলেই পাপ কথা শুদ্ধ হয়ে যাবে। হাঁসগুলি নদীর কিনার কিনার দিয়ে জল কেটে জল কেটে বাড়ির দিকে ফিরছে। সবাইকে একটা ঠিকানায় ফিরতে হয়।······

বৃষ্টি! বৃষ্টি! ঝম-ঝম বৃষ্টি!······

মঙলি চুল খুলে মুখ আকাশের দিকে রেখে ভিজছিল। আর সে ভেজাই কাল হল। জ্বর এল। বিছানায় শুল। গায়ে মাথায় ব্যথা! শুয়ে না পারে। জ্বর হু হু করে বাড়ছে। ছটফট করছে। বাড়িঘর

উঠোন মাথায় করে নিয়েছে। বেগতিক—ডাক্তার না ডাকলেই নয়। কালো হলে কি হবে বাড়ির বড় মেয়ে বলে সবার প্রিয়।

অবশেষে গ্রামের সুধীর ডাক্তার এল। সবেমাত্র ডাক্তারি আরম্ভ করেছে সে। কলকাতায় পড়াশুনা করেছিল। বাড়িতে ডিস্পেনসারি দিয়েছিল। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হলেও অল্পদিনেই বেশ নাম করেছিল। হাতের যশ আছে। কিছুদিন হল ঘরে নতুন বউ এনেছে। ডাক্তারবাবু মঙলিকে ভাল করে দেখল। কোথায় ব্যথা? কি খেতে ইচ্ছা করে?

এই সব জিজ্ঞাসা করতে করতে কপালে মাথায় হাত দিল। স্টেথিস্কোপ লাগাল। মঙলির সরম লাগলেও ভাল লাগছিল। বাবা-মা'র হাতের স্পর্শ থেকে এই হাতের স্পর্শ সম্পূর্ণ আলাদা—অন্য স্বাদ,—অন্য স্পর্শ! চোখ বুজেও মঙলি সুধীর ডাক্তারের মুখটা দেখতে পেল। মনে হল চারুদির বরের মত।

হাঁসগুলি কোথায় গেল? বাজপাখি তো ছোঁ মেরে নিয়ে গেল না! আয়···আয়··· প্যাঁক···প্যাঁক।···

হাঁসগুলি কোথায় গেল! খাল কিংবা বিলে হারিয়ে গেল কি?

আয়···আয়···প্যাঁক···প্যাঁক।

দিন সাত পর মঙলি ভাত খেল। এই সাতদিনে সুধীর ডাক্তার এই বাড়ির আত্মীয় হয়ে গেল। মঙলির যেন ভাল লাগতে লাগল মানুষটাকে অথচ এই মানুষটার নামে কত কিছু শুনেছে। ভাল লোক নয়। সবকিছুই মিথ্যা মনে হল। মধুর স্বভাব আর অল্প কথা বলার মধ্যে থাকে অনেক কথা বলার রহস্য। আর সেই রহস্যঘেরা চাহনি মঙলিকে কোথায় টেনে নিয়ে গেল। নিজেকে আর রক্ষা করতে পারল না ও। ধলেশ্বরীর জোয়ারের মত ভেসে গেল। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় কিছুই খেয়াল হল না, খড়-কুটোর মত ভেসে চলল। চলার পথে কোন ঘাট নেই। কোন স্টেশন নেই।

ধলেশ্বরীতে ভাটা পড়ল। বিলের জল, নদীতে নেমেছে। পার

থেকে জল অনেক নিচে। বালি আর জল—জল আর বালি। পদচিহ্ন রেখে রেখে ঢেউ হয়েছে। হাঁসগুলি পারে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়ছে। ভিজে শরীর রোদে শুকোচ্ছিল। মঙলি পেছন থেকে তাড়া করল আর তক্ষুণি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্যাঁক···প্যাঁক ··প্যাঁক···। কিচির-মিচির আরম্ভ হয়ে গেল।

মঙলি খুশিতে টাল-মাটাল। হৃদয়ে জোয়ার উথালি-পাথালি। এখন ধলেশ্বরী নদীকে মনে হয় সমুদ্র। হালকা নীল আকাশ মনে হয় খুব কাছে ; ইচ্ছে করে উড়ে যেতে। মাঠ-ঘাট ঘর-বাড়ি সবকিছু—সবকিছু মনে হয় রঙিন। এখন আর আকাশে বাজপাখি নেই। চিল আছে। অবশ্যি চিল শান্ত পাখি। এখন শিয়ালের ভয়। কখন যে আসবে আর হাঁস নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। সেইজন্য চোখে চোখে রাখতে হয়। মরালগুলি তো এক জায়গায় থাকে না। কখনো পুকুরে কখনো খালে। এত খায় তাতেও পেট ভরে না রাক্ষসগুলির।

কার ঘরে কুল আছে,—কার ঘরে চালতা আছে, আমলকী, আচার আছে সেই সবের খোঁজ করে মঙলি। কোনদিন গাছ থেকে কাঁচা তেঁতুল পেড়ে খায়। মাসখানেক হল শুধু টক খেতে ইচ্ছে করে। উপা, কানু হাসছিল আর বলেছিল—একটা কথা, ছিঃ ছিঃ ওরা কি জানতে পেরেছে বা সত্যি এল নাকি ? মঙলি আঁৎকে উঠল। বাইরে ধ্যাৎ করে উড়িয়ে দিলেও ভেতরে ভেতরে ভয়ে ঢিপ্-ঢিপ্ করছিল। যদি কিছু হয় তবে কি হবে। কিছুদিন হল লক্ষ্য করছে, টক খেতে চাইলেই মা অন্যচোখে তাকায় : সে চোখে যেন কিসের বক্তব্য। এই সব চিন্তা উড়িয়ে দিলেও কেন যেন ভয় হয়। ডাক্তারের মুখের ছবি, দেহের ছবি ভেসে ওঠে। রাত্রের ঘটনা মনে পড়ে। না-না —কিছুতেই না। এ হতে পারে না। কি করে সম্ভব।

কয়েকদিন পর একটি চিঠি এল। ইমানগঞ্জ থেকে এসেছে, লিখেছে মেয়ে পছন্দ হয়েছে। আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই বিয়ের দিন ঠিক

করবার জন্য। সেই তো পছন্দ হল। এত দেরিতে হল কেন? কথাটা শুনে কাঁদতে লাগল। এখন কি বলবে? কি করবে? কি করে মুখ দেখাবে। তারপর শুনল এই সম্বন্ধ ঠিক করবার জন্য—মা'র গহনা বিক্রি করতে হয়েছে। কেন না নগদ টাকার জন্য ছেলে রাজী হয়েছে। মঙলি দুঃখে, ক্ষোভে নদীর দিকে ছুটতে লাগল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তারপর কি মনে করে আবার বাড়ি ফিরল।

গভীর রাত্রে মঙলি উঠল। মা টের পেল অথচ কিছু মনে করল না! ভাবল হাঁসের কাছে গেল। শিয়াল এল কি না তা দেখবার জন্য প্রায়ই উঠতে হয়। আজকেও হয়তো শিয়াল তাড়াবার জন্য উঠল।

মঙলি পায়ে পায়ে নদীর ঘাটে এল। নদীর জলে মৃদু মৃদু ঢেউ আবছা আলোয় উঠছে নামছে। বর্ষার মত গর্জন নেই। কিন্তু মঙলির কাছে মনে হল বর্ষাকাল। আস্তে আস্তে জলে নামল। হাঁটু জল। কোমর জল। একবার ফিরে বাড়ির দিকে চোখ রাখল। জল এল। হাঁসগুলি যেন কাছে—খুব কাছে এল। বাজপাখি, শিয়াল যেন পাশের বনে চলে গেল। ঢেউ লাগছে। কাপড় সায়া ভিজে দেহে জল প্রবেশ করছে। মনে হল কে যেন বুক জলে ধাক্কা দিল। অকস্মাৎ কে যেন সবকিছু গ্রাস করল। কে যেন সব লজ্জা হরণ করল। গলা ভিজল, আর একটু আর একটু তারপর মাথা। ডুব দিল। অন্ধকার, অন্ধকার। আর কিছুই দেখতে পেল না! হাঁস, বাজপাখি, শিয়াল, হিজলবন, হালকা নীল আকাশ। শাপলাবনের ঢেউ। সোনালী সবুজ ধানক্ষেত সবকিছু—সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। কাপড়, শায়া পায়ে জড়িয়ে গেল। অতল গভীর জলে হাবুডুবু খেতে লাগল। মাকে ডাকতে ইচ্ছা হল, অথচ গলা দিয়ে কোন কথা বের হল না। চোরা গর্তে—ঘূর্ণিতে পাকিয়ে পাকিয়ে তলিয়ে গেল। উঠতে চেষ্টা করেও উঠতে পারল না।......

হাঁসগুলি চিরদিনেব জন্য হারিয়ে গেল।......

• স্বয়ম্বরা

টুড়ুম—টুড়ুম—ড়ুম—টুড়ুম।

টিকারা বাজছে। অদূরে পুকুর কাঁপছে। ধানগাছের ঢেউ—তরঙ্গে শব্দটা দূরের গ্রামে চলে যাচ্ছে। দুয়ারের চারিদিকে জল। চড়া রোদে নৌকো যাই যাই করছে। মাখনের বাইচের নৌকো দুয়ারে কাৎ করে রাখা হয়েছে। গাব দেওয়া হবে। নৌকো যাতে জলের ওপর দিয়ে তরতরিয়ে চলতে পারে। ভাল বড় গাব ঢেঁকিতে কুটে ভাসিতে পচিয়ে আলকাতরার মত করা হয়েছে। মনোযোগ দিয়ে নিজের হাতেই গাব দিচ্ছে মাখন—অন্যের উপর ভরসা করা যায় না। সামনেই একটা মান-সম্মানের—হারজিতের প্রশ্ন রয়েছে। শরীর চড়া রোদে লবণ হয়ে গেছে। কাছিমের মত পিঠ, শালগুড়ার মত শক্ত হাত। গলুইয়ের মত পা, ঝাঁকড়া-কোঁকড়া চুল। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে খাটো করে পরেছে। বয়সের অনুপাতে মাখনকে অনেক বড়ই দেখা যায়।

এক পোচ গাব দেওয়া হলে গাছের নীচে জিরোতে বসল মাখন। এক ছিলিম তামাক খেলে কেমন হয়? ঘামে সমস্ত দেহ নেয়ে একাকার। এবার যেন রোদ বেশি। শায়নের সুরুতেই এত রোদ। ধানগাছ আর আস্ত থাকবে না। না—লালচে হয়ে যাবে। তামাক সাজতে সাজতে ফেলে আসা ছোটবেলাকার কথা মনে পড়ল। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নেয়, গামছাটার জন্য হাত বাড়ায়। নৌকাটা রোদে চিক চিক করছে। গাব দেওয়া ভালই হচ্ছে—এই ভেবে আনন্দিত হোল। নিশ্চয়ই এবার বাইচে বাজিমাৎ করতে পারবে। একটা চিল আকাশে উড়ছে, চিলটার দিকে তাকাল। কল্কেতে তামাক ভরে আইলসা থেকে ঘুঁটের আগুনের টুকুরো তুলে বুড়ো আঙুলে চাপ দিল্। ভুড়ুক—ভুড়ুক টেনে বুড়ো মানুষের মত ধোঁয়া

ছাড়ল। ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল। নীলকণ্ঠ আকাশে টুকরো টুকরো মেঘের খেলা।

বাপ মরে যাওয়ার পর এখন মাখনই বাড়ির কর্তা। জমি জমা দেখাশোনার পর নিজের সখ, পালা-পার্বণ নিয়েই মেতে থাকে। চৈত মাসে নীলের সঙ সাজে, পৌষ-কালীতে রাত ভরে যাত্রাদলে মেয়ে-ছেলের পার্ট করে—অবিকল মেয়ে হয়ে যায়, কেউ ধরতে পারে না। গলায় কোকিলের স্বর আর গানও গাইতে পারে ভাল। তারপরেই বর্ষার বাইচ। মাঠঘাট জলে টই-টম্বুর হয়ে গেলে রঙ্গিলাকে নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকে—খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত ভুলে যায়।

খাল বিলের দেশ বিক্রমপুরে রঙ্গিলা বলতে মাখনের নৌকোকেই বোঝায়। যেখানে বাইচ হবে সেখানে যাবেই ও। হারজিতের কোন বালাই নেই। বেশির ভাগই হেরে যায়—জিততে পারে না। একবার হেরে গেলেও আর একবার জিতবে এই সান্ত্বনা নিয়ে আবার বাইচে যোগ দেয়। আসলে রঙ্গিলা যত সুন্দর দেখতে তত কাজের নয়—চলে না ভাল—অবিশ্যি এ কথা কে বোঝাবে—মানতে চায়না—উল্টে আরো দশটা কথা শুনিয়ে দেয় মাখন। বাইচে জিততে না পারলেও রঙ্গিলাকে লোকেরা দেখতে চায়—তার কারণ মাখন নিজেই বাবড়ি চুল নেড়ে যখন গলা ছেড়ে টান দেয়—'সাগর কুলের নাইয়ারে' —তখন সকলের দৃষ্টি রঙ্গিলার দিকেই চলে যায়।

শিকারপুরের হারাণ মণ্ডল বলেছে এবার যে বাইচে জিততে পারবে কাপের সঙ্গে তার মেয়ে টগরিকেও তাকে দেবে অর্থাৎ তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে। এই অদ্ভুত কথা অনেকেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, পাগলামি বলেছে। ছি ছি করেছে। কেননা গেরামের ইজ্জত আর রইলো না! কোন কালে কেউ কি শুনেছে বাইচের সংগে এমন অবাস্তব প্রস্তাবের কথা বলে। এ যেন মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা, যে লক্ষ্যভেদ করতে পারবে তারই গলায় মালা দেবে মেয়ে! এ কালে এইসব হয় নাকি! এইরকম একটা উদ্ভট চিন্তা কেন যে

মাথায় এল তা অনেকেই ভেবে পেল না—হাটে বাজারে তা নিয়ে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল।

টুডুম···টুডুম···ডুম—ডুম—টুডুম।

কোথায় যেন টিকারা বাজছে। মাঠ পেরিয়ে দূর গ্রামে কোথায় যেন গম গম শব্দ হচ্ছে। টুডুম—টুডুম। মনে হয় রাইমোহনের টিকারা। মাখনের যেন কান ফেটে যাচ্ছে। অসহ্য মনে হল শব্দটা। মাখন হুঁকাটা রেখে গলুইতে গাবের নুরি দিতে লাগলো। ছপ ছপ শব্দে গাব সারা শরীরে ছিটে এল। আর এক পোচ দিলেই শেষ। এরপরে গলুই থেকে আরম্ভ করে শেষ অবধি হলুদ রঙ দিয়ে চালতা লতার আলপনা দিতে হবে, নাম লিখতে হবে। টুকটাক কাজ শেষ করতে আজকের দিনটাও লেগে যাবে। খাটনি কি কম।

ঝপ-ঝপ ছপ-ছপ শব্দ ভেসে এলে সামনের খালের দিকে তাকাল মাখন। খাল না বলে—নদী বলাই ভাল। ধানজমি মাঠ-পুকুর জলে একাকার। বোঝা যায় না কোন্‌টা মাঠ। বর্ষার জলে মিশে এক হয়ে গেছে। স্কুল থেকে ছেলেরা ফিরছে—পাশাপাশি নৌকোয় বাইচালি খেলা খেলছে। চ্যালে—লা—লা, চেলে লা—লা। মারো টান, হেঁইও বাইরা গেছে হেঁইও। শব্দ করে ওরা চলে গেল। জলে ঢেউ উঠে বাড়ির গাছে ধাক্কা খেল। বৈঠার জল চারিদিকে ছিটছে। তীরের মত জল কেটে জল কেটে নৌকোগুলি ছুটছে। মনে হয় জলের নীচে দিয়ে যাচ্ছে। জলের ঢেউ লেগে নামছে-উঠছে। মাখনের চোখ অতীতের দিকে তাকাল।

কেয়াইনের প্রাইমারি স্কুল থেকে ফিরছে। ইউনিয়ন বোর্ডের স্কুল। চতুর্থ শ্রেণী অবধি ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়তো। সেই সময়ে টগরিকে দেখেছিল। উসকো-খুসকো চুল। লাল রঙের ফ্রক গায়ে। কাঁচা হলুদ গায়ের রঙ। অন্যান্য মেয়েদের মত নয়—ছেলেদের সঙ্গে খেলতো, কথা বলতো—ঝগড়া করতো। কিন্তু স্বভাবে

ছিল মা মনসা।

দীর্ঘদিন পর আবার সেই টগরিকে নিয়েই রাইমোহনের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। না জিততে পারলে মুখ দেখানো যাবে না। ভুড়ুক… ভুড়ুক তামাক টেনে শেষ করলো। মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। সেই ছেলেবেলাকার প্রতিশোধ নিতেই হবে। ধানগাছে বাতাস নেচে নেচে টুড়ুম টুড়ুম শব্দ নিয়ে আসছে যাচ্ছে। নৌকোটার গায়ে হাত বুলিয়ে গুন গুনিয়ে উঠল। বউল গাছের ডাল থেকে একটা মাছরাঙা পাখী জলে ঝাঁপ দিল। অনেকক্ষণ থেকে ওৎপেতে বসেছিল। চারিদিকে জল ঢেউ খেলে ছড়িয়ে গেল। মাছ ধরতে পারলো কিনা ঠিক বোঝা গেল না বা দেখা গেল না।

আবদুলা মোহনগঞ্জের হাট থেকে ফিরছিল। মাখনকে দেখে দূর থেকে গলা ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ মাখনভাই, হাটে যাও নাই? ইলশা মাছ খুউব উঠছিল।

ঃ নাও থুইয়োতো যাইতে পারি না। হুনছ তো সব।

ঃ তা হুনছি। মণ্ডলের পো এইড্যা কোন্ ছ্যাশের তামাসা আমদানি করলো—সাতপুরুষেও তো হুনি নাই এমন অলক্ষুইণা কথা—ভীমরতি হইছে নাহি।

মাখন এ কথার কোন জবাব দিল না।

আবদুলার নৌকোও স্রোতের টানে অনেকটা এগিয়ে গেছে। নৌকোর জন্য মাসখানেক হোল হাট বাজারে যাওয়া বন্ধ। দিন রাত খালি রঙ্গিলার চিন্তা। ক্ষণে ক্ষণে টগরির মুখটাও মনে পড়ে। মুখের গড়ন খারাপ নয়—এখন আরো সুন্দর হয়েছে, রূপে লাবণ্যে সুগঠিত হয়েছে দেহ।

ঃ কাম হয় নাই?

পিছন দিক থেকে মাখনের মা এসে ছেলেকে প্রশ্ন করল। সব সময় কাছে এসে দেখতে পারে না। সংসারের কাজকর্ম আছে। রান্না-বান্না আছে। শরীরেও কুলায় না, বয়েস তো আর কম হ্ল না।

মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। দেহের চামড়া কুঁচকে গেছে। কোন-ক্রমে দেহটা সোজা রেখেছে। ছেলে কোন কথা বলছে না দেখে আবার বলল,—হারাণ নাকি রাইমোহনের সঙ্গে টগরিরে বিয়া দিবো। এ আবার কি শুনি—এক মুখে কত কথা কয়। কইছিল টগরিরে আমাগো ঘরে দিবো। কই কথা রাখলো ?

ঃ রাখ দেখি তোমার পুরানো কথা।

ঃ ক্যান রাখুম। কথা দিয়া কথা রাখে না হেই মানুষ ভাল না। দেখিছ অন্য কোন মতলব আটছে। লজ্জা নাই। হাটে বাজারে মেয়েরে জাহির করত্যাছে। এটা একটা ছুতা। জানে রাইমোহন জিতব—চালাক কি কম !

গজ গজ করতে করতে কিরণবালা বাড়ির ভেতরে চলে গেল। স্বাভাবিক কারণেই হারাণ মণ্ডলের প্রতি বিরূপ। টগরি স্কুলে পড়ার সময় কথা দিয়েছিল মাখনের সঙ্গে বিয়ে দেবে। কিন্তু মাখনের বাবা মারা যাওয়ার পর সে কথা বেমালুম ভুলে গেল। একবারও এবাড়িতে আসে না। খোঁজ খবর নেয় না। অথচ এককালে মিতা ছিল। দুই বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। মানুষের যে এত পরিবর্তন হতে পারে এর আগে ধারণা ছিল না। এখন মাখন বড় হয়েছে। বাড়ির সর্বময় কর্তা। জমি জিরাত থেকে সব কিছুই মাখনকে দেখতে হয়। স্কুলে বেশিদূর পর্যন্ত এগুতে পারে নি, নিজেদের গৃহস্থালী কাজেই হাত লাগিয়েছিল। সংসারের কাজে ডুবে গিয়েছিল বলেই টগরির কথা ভুলে গিয়েছিল। মাঝখানে একবার শুনেছিল রাইমোহনের সঙ্গে টগরির বিয়ে হবে।

রাইমোহন ম্যাট্রিক পাশ করে গ্রামের স্কুলেই মাস্টারি করছিল। জমি-জমা কম নয়। বেশ বড়লোক। মাস্টার হিসাবে খ্যাতি চারি-দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রকম ছেলে যখন টগরিকে দেখে বিয়ে করতে চাইলো হারাণ মণ্ডল শুনে তো অবাক, যেন আকাশ থেকে পড়ল। এখন কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। মাখনের সংগে

বিয়ে না দিলে কথার খেলাপ হয়, এবং তা বড় একটা ইচ্ছা নয়। কিন্তু রাইমোহনের মত ছেলে যার নাকি টাকা-পয়সার অভাব নেই। অমন সুন্দর বাইচের নৌকা যার ঘাটে বাঁধা। অথচ মাখনের বাবা প্রাণের বন্ধু ছিল। অনেকবার বিপদের সময় সাহায্য করেছে, তাছাড়া মাখনও তো খারাপ ছেলে নয়! বাইচের নৌকোও আছে কিন্তু পড়াশুনায় কম —তা কি গ্রাম দেশে সকলের থাকে, জেনেই বা কি হবে—করবে তো জমি চাষ। এই সব ভাবতে ভাবতে শ্রাবণ মাস এসে গেল। পূর্ব-পুরুষের প্রচলিত নিজেদের বাইচ।

ভাঙ্গাভিটা-মরিচার বাইচ বিখ্যাত। দূর দূর গ্রাম থেকে লোকেরা এই বাইচ দেখতে আসে। ওদিকে বেলতলি এদিকে হাসাড়া বাসাইল মানে আশেপাশের তিন চার মাইলের মধ্যে কোন লোক বাদ পড়ে না। বৎসরের উৎসব। প্রতি বছর হারাণ মণ্ডল কাপ দেয়। এবার কি মনে করে ঘোষণা করলো—রাইমোহন ও মাখনের সঙ্গে বাইচ হবে, যার নৌকো প্রথম হবে সে টগরিকে বিয়ে করবে। এই ভারতেই কোথায় যেন এই রীতির প্রচলন আছে—কোন্ জায়গায় ঠিক মনে করতে পারলো না। যাই হোক টগরিকে নিয়ে যে দ্বন্দ্বে পড়েছিল তার থেকে রেহাই পেল। একটা বিরাট সমস্যা এই ভাবে মেটাতে পারবে বলে নিজেকে বেশ হাল্কা মনে হোল। কেননা কোনদিকেই মতি স্থির করতে পারছিল না।

এই সব কথা চৌকিদারের মুখে শুনেছিল মাখন। আর তখন থেকেই প্রস্তুতি। এবার চরে জল বেশী দেখা যাচ্ছে। অনেকের উঠনে জল উঠেছে। আষাঢ় মাসে রাতদিন বৃষ্টি হওয়ার দরুণ জলের তোড় বেশী। চারিদিকে শুধু জল আর জল। বাড়িগুলি দ্বীপের মত মনে হচ্ছে, আর ধান গাছগুলি বাতাসে হেলে দুলে নেচে বেড়াচ্ছে। দু'চোখ সবুজ হয়ে যায়। দূরে ধলেশ্বরী নদীতে পাল তোলা নৌকোর সারি দেখা যায় ছাবির মত। মাখন হাত পা ঝাড়া দিয়ে উঠল, জলে নামলো। কয়েকটা ডুব দিয়ে উঠে এল। সূর্য পশ্চিমদিকে হেলেছে।

আজ দিনটা কি ভাবে যে শেষ হোল বুঝতেই পারলো না। দূরে তখনও টুডুম—ডুম—টুডুম—টুডুম আওয়াজ ভেসে আসছে। গাছ-গাছালিতে ছায়া-ছায়া বিষণ্ণ বিকেল।

গলুইতে সিঁদূর ফোঁটা নিয়ে জলে নামল রঙ্গিলা নাও। উলুধ্বনি ভেসে এল। প্রদীপ জ্বালিয়ে বরণ হোল। নৌকোয় যারা যাবে সকলেই প্রস্তুত। মাখনের সমবয়সীই সব। সবারই স্বাস্থ্য ভাল। এতগুলি একই বয়সের লোক দেখে মনে হবে গ্রামে বুঝি লিকলিকে চেহারার লোক নেই। যুদ্ধে যাবার জন্যে সকলেই এসে গেছে। সকলের হাতে সমান এক হাতি বৈঠা। হাল ধরবে মাখন। রঙ্গিলা নাওয়ের রঙীন মাঝি। নিতাই কাঁসি বাজাবে। রামু টিকারা নিয়ে বসেছে। লাঠি দা ইত্যাদিও নেওয়া হয়েছে। বলা তো যায় না, মারামারিও লাগতে পারে। সবুজ সাদা নিশান পতপত করে উড়ছে। চেলে লা লা…। গলুইতে জল ছিটিয়ে রঙ্গিলা জলে ভাসল। টিকারার আওয়াজ হল টুডুম—টুডুম—টুডুম—। ছপ-ছপ শব্দে জলকেটে জলকেটে এগিয়ে চললো—পিছনে পড়ে রইল কিরণবালার ছলছল চোখ। কেননা প্রতিবারেই একটা না একটা গণ্ডগোল লাগে, মারামারি হয়—নাও ডুবে যায় কত কিছু ঘটনা ঘটাতে পারে। ভালয় ভালয় না ফেরা অবধি স্বস্তি নেই। মায়ের মন তো!

রঙ্গিলা গ্রাম ছেড়ে খালে পড়ল। ক্রমে ক্রমে নৌকো অদৃশ্য হোল। কে যেন গেয়ে উঠল—ও বিদেশী নাইয়া কোন্ বা দেশে যাও বাইয়া। তোমার নৌকায় তুইলা নাও মোরে। টঙ্ টঙ্ টঙ্ কাঁসি বেজে উঠল। তালে তালে টিকারাও বাজছে—টুডুম—ডুম—টুডুম। আস্তে আস্তে বৈঠা পড়ছে ঝপ ঝপ। এখনই ক্লান্ত হয়ে পড়লে বাইচের সময় কি করবে। আর একটু এগুলোই তো ভাঙ্গাভিটা। মাখনের চোখে মুখে উদ্বেগ, কি যে হবে—গ্রামের সম্মান থাকবে কিনা। নানা রকমের হাজারো প্রশ্ন। এর মধ্যেও টগরির মুখ, অতীতের স্মৃতি

মনে এলে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল।

আজ সেই দিন।

নদীর দু'পারেই কেরায়া নৌকা ছোট মাঝারি সব রকমের নৌকো লেগেছে। লোকে লোকারণ্য। যেন হাট বসেছে। চারিদিকেই গিজ গিজ করছে। দোকানদারেরা নৌকায় বিস্কুট, চানাচুর, চীনে-বাদাম, মিষ্টি, নিমকি ঘুরে ঘুরে বিক্রি করছে। টিকারার শব্দে চারি-দিকে গমগম করছে। দু' একটা সঙের নৌকো চলে যাচ্ছে, কোনটায় হনুমান—কোনটায় ভাল্লুক! ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাই দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছে। জলের ঢেউ নৌকোয় লাগছে—দুলছে। কথার শব্দে সমস্ত জায়গাটা গমগম করছে। সূর্য ঠিক মাথার ওপরে। নীল আকাশের নীচে চড়া রোদ জলের ঢেউয়ে নাচছে। মাখন রঙ্গিলাকে নিয়ে ঠিক জায়গায় চলে গেল। কেউ কেউ চীৎকার করে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—ঐ—ঐ যে রঙ্গিলা। সকলেই ঘেমে একাকার। গায়ে জল দিচ্ছে। গলুইতে জল দিল আবদুলা। দেখতে দেখকে বাইচ আরম্ভ হয়ে গেল। টুডুম···টুডুম···। কোরাসের শব্দ ভেসে এল ঃ মারো টান হেঁইও, বাইরা গেছে, হেঁইও। পাছে পড়ছে, হেঁইও, সাবাস জোয়ান হেঁইও। ঝপ ঝপ এক সঙ্গে বৈঠা পড়ছে। আবদুলা ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে বৈঠা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাপুর হাপুর ফেলছে। আর সকলে একবার ওপর হচ্ছে, আর একবার উঠছে সঙ্গে সঙ্গে বৈঠাও পড়ছে। নিতাই ধ্বনি দিচ্ছে—সাবাস রঙ্গিলা, আর একটু। হেঁইও—মারো টান। হেঁইও, বাইরা গেছে, হেঁইও। মাখন প্রাণপণে পেছনের হাল ধরে আছে। নৌকো তীরের মত ছুটছে। গলুই জলের নীচে দিয়ে চলে যাচ্ছে। ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে নৌকো চলছে। জলকেটে—জলকেটে রঙ্গিলা ছুটছে। কাঁসি বাজছে টঙ···টঙ···টঙ। টিকারা বাজছে টুডুম····টুডুম···টুডুম। নৌকো দুলছে—হেঁইও, মারো টান হেঁইও। ঢেউ ভেঙ্গে পারে এসে পড়ছে। জল ছেঁচে ফেলছে কালাচাঁন। টুডুম ··টুডুম···। —ছপ—ছপ—। ঝপ—ঝপ। টঙ···

টঙ। বৈঠা ফেলার শব্দ। টিকারার শব্দ। কাঁসর ঘণ্টার শব্দ: কথার শব্দ। জলের শব্দ। সব কিছু ছাড়িয়ে রঙ্গিলা চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর শোনা গেল গান গাইতে গাইতে রঙ্গিলা ফিরছে ঃ জয় দেলো রামের মা—জয় দে—কাঁসি বাজছে টঙ্—টঙ্। আবদুলা মাথায় একটা রুমাল বেঁধে নেচে নেচে গান গাইছে। টিকারায় শব্দ হচ্ছে—টুড়ুম—টুড়ুম। বীরের মত মাখন দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাখন মাঝি জিন্দাবাদ। চেলে লা···লা—জিতলো কে—রঙ্গিলা নাও টুড়ুম—জিতলো কে—মাখন মাঝি—টুড়ুম। চেলে লা লা—লা চেলে লালা—লা—।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। কাঁসর ঘণ্টা বাজলে, শালিখ চড়ুই বাসায় ফিরলে রঙ্গিলা বাড়ির দিকে ফিরল। সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেও মনে আনন্দ—নিজেদের সম্মান রাখতে পেরেছে। মাখনের চোখের সামনেও সেই ছোট বেলাকার টগরির মুখটা ভেসে উঠছে। আনন্দেরই কথা—কতদিন পর রঙ্গিলা জিতেছে। যা নাকি কেউ কল্পনাই করেনি। সকলেই ভেবেছিল রাইমোহন জিতবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হোল না, অঘটন ঘটনা ঘটে গেল। আকাশে সন্ধ্যাতারা ঝলমলিয়ে উঠেছে। খালের জলে ঝিকমিক করছে। দূরের ধানক্ষেতে জোনাকিরা নিভছে জ্বলছে। আবছা আলোয় রঙ্গিলা আস্তে আস্তে চলেছে। মৃদু বাতাস গায়ে লাগছে। মাঝে মধ্যে রামু টিকারায় ধ্বনি তুলছে—টুড়ুম···টুড়ুম—টুড়ুম।

কিন্তু এত আনন্দ, এই জয় যেন মাখনের মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। সে ঠায় জলের দিকে চেয়ে আছে। যে জলে সন্ধ্যার ছায়া কাঁপছে, টগরির মুখটা ভেসে উঠেই ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। টগরির বাবার কথাটা মনে পড়ল। এবার বাইচে যে জিতবে তার সঙ্গে সে মেয়ের বিয়ে দেবে। কিন্তু টগরি? সে জানে টগরি তাকে পছন্দ করে না, তাকে ঘৃণা করে। বরং টগরি রাইমোহনকেই পছন্দ করে। কথাটা মনে হতেই হু হু করে কেঁদে ফেলল মাখন।

• শ্বাপদ

রাত কত হবে? ঘড়ির টিক টিক শব্দ! আর জানালার আবছা-আবছা আলো-অন্ধকার। অন্ধকার। ঘর আর বুকে-বুকে ঘটাং ঘটাং ঘট্ ঘটাং ট্রেন চলার শব্দ! রাত কত হবে? ঘট ঘটাং ঘট……। টিক্-টিক্-টিক্। রাত কত—কত হবে?

দ্রুত লয়ে এই সব দৃশ্যগুলো অন্ধকার ঘরের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান, মঞ্চে অবিনাশ ঘুরছে আর ঘুরছে।

চতুর্ভুজের মত ঘর। সমস্ত ঘরময় বিছানা রয়েছে। কোণের দিকে পা ভাঙ্গা আলনা। স্তূপাকার জামাকাপড়ে ঠাসা-ঠাসা আর ঠাসা। দেওয়াল ঘেঁষে পুরোন ট্রাঙ্ক। সুটকেশ, রান্নার জিনিষপত্র ভাতের হাঁড়ি। কড়াই। থালা ঘটিবাটি। আসন। একটা সংসারের যাবতীয় সব। ভেণ্ডার গাড়ী যেন।

ঘটাং ঘট ঘটাং। মাথাটা চিনচিন করছে। শরীর জ্বলছে। ঘর দুলছে। আর সেই মেঝেয় বিছানা। ঘরময় বিছানা। দক্ষিণ দিকে শুয়ে আছে সুবর্ণা। পাশে ছোট্ট, বৈশাখী তারপরে অমলেশ। আর উত্তর দিকে অবিনাশ। অবিনাশ বইকি। অ—বি—না—শ।

রাস্তায়—রাস্তায়, স্কুল কলেজের টিফিন পিরিয়াডে—গরমা-গরম চানাচুর। কুর-মুর—কুর-মুর। আর ঘুঙুরের শব্দ। মাথায় চোঙা মতন টুপি। গায়ে ছোপ ছোপ লাল রঙের ছাপ। নেচে-নেচে। গরমা-গরম। কুরমুর-কুরমুর। গ—র—রম-গরমা-গরম। চানাচুর। গ—র—অ—ম।

কবিয়াল অবিনাশ। আজ চানাচুরওয়ালা। ন কেলাশ অবধি পড়েছিল। পড়েই বা কি হল। মাথা ঘুরছে। ভাবতে পারছে না। গাল ভেঙ্গে চ্যাপটা হয়ে গেছে। ধনেশ পাখীর মত নাক হেলে পড়েছে।

চোখের তারা রক্তবর্ণ। কপালের দাগগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে ভঙ্গে নেমে গেছে খাদে। সজারু কাঁটার মত সাদাকালো চুল। লিকলিকে দেহের গঠন। হবেই বা না কেন? চিন্তা কি কম। র‍্যাশনের টাকা, ঘরভাড়া, ছেলেমেয়েদের কাপড়-চোপড়! সংসারতো আর ছোট নয়। তারপরে রয়েছে আলু, বেগুন পটল আর তার যা দাম! ক্রমে ক্রমেই বাড়ছে। একটাকা থেকে দু'টাকা। দু'টাকা থেকে তিন টাকা। বাড়ছেই। অথচ আয় বাড়ছে না। ছোট্টু বলেছিলঃ মাছের কথা। ওর বুঝি ইলিশ মাছ খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। আহারে! পদ্মার ইলিশ। মনে করে যদি ইলিশ মাছের ফটো তুলে রাখতো! তবে—তবে, আজ ছোট্টুকে দেখাতে পারতো। এবং দেখিয়েই ভুলিয়ে রাখা যেত। তাজ্জব আইডিয়া! ইলিশ, জল। জল-ইলিশ ইলশে গুড়ি। ইলিশের নাও।

অবিনাশ নিজে বহুবার ইলিশের জাল নিয়ে পদ্মা নদীতে গেছে। সঙ্গে থাকতো আব্দুল। তখন তো আর এ রকম চেহারা ছিল না—তখন চেহারায় জৌলুষ ছিল। যেমন দেখতে—তেমন বলতে। যাত্রাগানে কবিয়াল হত সে। আশে পাশে গেরামের এমন লোক ছিল না যে অবিনাশ কবিয়ালকে না চিনতো—না জানতো। সবারি আপন, প্রিয় ছিল।

সেই অবিনাশ। পদ্মা,···গোয়ালন্দ,···স্টিমার,···ট্রেন,···রিফিউজি, ···হিন্দুস্তান,···পাকিস্তান,···ইনকেলাব জিন্দাবাদ,···শিয়ালদহ স্টেশন, ···লঙ্গরখানা,···হাহাকার,···কান্না,···চিৎকার,···বলাৎকার,···হৈ-হুল্লোড়,···আতঙ্ক,···ট্রাম,··ডবল-ডেকার,···মিছিলের শহর,···জনতার ভিড়,···আত্মীয় স্বজন,···হিজলের বন,···পদ্মা,···সব উলট-পালট, বাবু···বিবি···। লঙ্গরখানা···, ফুটপাত সব কিছু সব কিছু উলট-পালট হয়ে গেল। দুনিয়ার আকাশ বদলে গেল। একটা আকাশ হারিয়ে গেল।

.তারপর···।

ডিহি শ্রীরামপুরের বস্তির ঘর। বারো ঘর এক উঠোন। মেয়ে মানুষ। পুরুষ মানুষ। এক আর এক। দুই আর এক। তিন-দুই এক। জল, কল, ধোঁয়া, ড্যাম্প, ভ্যাপসা গন্ধ। টেক্কা টপ ফ্লাশ। মারামারি, হাতাহাতি, সোডার বোতল। দৌড়াদৌড়ি। পুলিশ, জনতা, লাঠি। কাঁদুনে গ্যাস। বোম, ইটের টুকরো। রক্ত, তারপর, আগুন, আগুন·····আঠার থেকে বিশ, বিশ থেকে আঠার ছোঁড়াছুঁড়ির প্রেম। কান্না, হাসি, অভিনয়, নিন্দা, গালাগালি। একটা দৃশ্যের পর দৃশ্য। গ্রহ থেকে গ্রহান্তর। ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ।

মাথা ঘুরছে, বুক ধড়ফড় করছে, মাথা ঘুরছে।

চানাচুর, গর-মা—গ—র—অম ভাজা। ঘুঙুর-ঘুঙুর। কবিয়ালের গলায় নতুন বয়ান। নতুন সুর।

অবিনাশ। অবিনাশ আছ?

কে যেন ডাকছে। না—কেউ ডাকছে না। ঘরভাড়া না দিতে পারলে ছেড়ে দাও। তোমার মতন বখাটে ভাড়াটে চাই না। রাস্তা দেখ। বুঝলে? বুঝলে না?

হাড় পিত্তি জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল! বিতৃষ্ণা! ঘৃণা! যমের অরুচি!

আর রামস্বরূপ ভাটিয়া বলেছিল—সেলামী দেবে দু'হাজার।

হা—জা—র!

দেওয়ালে বাড়ীওয়ালার বিশাল বপু দৈত্যের মত ছায়াটা ভেংচি কাটল।

অবিনাশ ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

ছেলেকে কি করলে। একটা লাইন ধরিয়ে দাও। মেঘে মেঘে বয়স তো কম হল না। আর কতদিন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে, ছেলের তো হাত-খরচ-টরচ আছে। ব্লেড কিনতে হয়। সিগারেট-টিগারেট ফুঁকতে হয়। দাড়ি কামানোর সাবান কিনতে হয়। মাঝে মাঝে দুই একটা হিন্দি-ইংরাজী বই না দেখলে নয়। উপরন্তু প্রেম-টেম

আছে। কে—কে—কেগো ? কেউ না। তবে কি ? ছায়া—না—কেউ না।

অবিনাশ, অবিনাশ, অবিনাশ !

আমার প্রজাপতির খাতায় খুকীর নাম লেখা লেই রাজপুত্র। বেশী না। দুই টাকা ফী। বেশ—তুমি হাফ দিও। তুমি আমার দেশের লোক। তোমার মেয়ে বলে তোমারই দায়িত্ব রয়েছে তা ভেবো না। আমারও দায়িত্ব আছে। তুমি আমার গেরামের লোক। দেশ থাকলে কবে খুকীর বিয়ে হয়ে যেত। তুমি ভাব আমি কিছু বুঝি না। অবুঝ—নির্বোধ। সব বুঝি। স—অ—ব জানি। এই তো সময়। এরপর আর কি রাখতে পারবে ! উড়ে যাবে। বস্তীতে উড়ো পাখী কম নেই। খুকী তো কুরূপা নয়। ডাগর-ডাগর চোখ। মেঘবরণ চুল, হলুদ-বরণ গায়ের রঙ। পদ্ম ফুলের পাঁপড়ির মতন ঠোঁট। আর দেহের গঠন। না—না ··তা আব বলি কি করে আমি যে ওর জ্যাঠামশাই।

এই সেই কমন জ্যাঠামশাই। সুবর্ণার বেলায়ও বলেছিল ডাগর-ডাগর চোখ। মেঘবরণ চুল। হলুদবরণ গায়ের রঙ। আর—আর মাথা ঘুরছে। চোখ ঝাপসা লাগছে। অতঃপর বিয়ে। ফুলশয্যার রাত। বেনারসী, চন্দন কুমকুম। সেণ্ট, অলঙ্কার। শিরশির-উষ্ণ উত্তরে হাওয়া—সুবর্ণা—মাথা ঘুরছে। উরু ব্যথায় টন টন করছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পদ্মা-প্রমত্তা নদী। কীর্তিনাশা ! কলা গাছে ঘেরা বাড়ী, তুলসী তলায় সুবর্ণা। সাঁঝের প্রদীপ। কীর্তিনাশা। চোরাবালির চর। দর্শনা···গেদে···চেকপোষ্ট। সবুজ-গাড়ী, আর লাল গাড়ী ক্রসিং। মার বুকে ইস্পাত ফলার যন্ত্রণা ! মাথা ঘুরছে। চোখ ঘুরছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ঘর দুলছে।

অবিনাশের চোখের পাতা নড়ছে না। চারদিকে অন্ধকার। অন্ধকারে খোকনের মুখ, খুকীর মুখ দেখল সে। মনে হল ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত অনেক হয়েছে। হিস্-হুস্ শিসের শব্দে আবার কান

খাড়া হল। চোখ মেলে গলি থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল।

চা-দোকানের রোয়াক। কয়েকজন খোকন গুলতানি করছে। চুলগুলো উস্কো খুস্কো। হাতে সিগারেট। ইদানিং বিড়ি। ডোরাকাটা ফতুয়ার মত জামা গায়। কোমর থেকে পা পর্যন্ত গেঞ্জির মত প্যান্ট লেপটে আছে। কেউ বসে। কেউ কোমর চেতিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অজন্তা ইলোরার মত। শুনতে পেল। আরে যা! নকশাল বাড়ী যা দেখাল, বাংলা দেশ তা মনে রাখবে।

আন্দোলন! আন্দোলন!

রাখ বে! আন্দোলন! চাল কেজি চার টাকা। বুঝলি? দেশের কথা কেউ চিন্তা করছে না। দল নিয়ে সবাই ব্যস্ত। পার্টি-ফার্টি বাদ দে। যুক্তফ্রন্ট, কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ বুঝি না। আমরা স্রেফ খেতে চাই। বুঝলি?

তা-কি লালজল! আর কিস?

ইয়া—হো—।

কেয়াবাত। কেয়াবাত। তোবা! তোবা!

ছাড় বে। ভিয়েতনাম। কি হাল।

সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাকে হটিয়ে দেবার জন্য প্রাণপণ লড়ছে। আর তোরা কি করছিস। ঘেরাও। শালার পো শালা!

সুচিত্রাকে ঘেরাও---

কেয়াবাত! কেয়াবাত!

তোবা! তোবা!

নাসের কি করল? কিচ্ছু না। স্রেফ বুকনি। ব্যালা! ইস্রাইল এর বুকের পাটা আছে।

চুপ—চুপ পাগলি আতা হ্যায়।

আতা হ্যায়।

তুমসা নাহি দেখা···

আমি হারিয়ে যাবো। হারিয়ে যাবো।

কেয়াবাত ! প্যার মহাব্বত !

তোবা ! তোবা ! তোবা !

সাপের মত নাইলনের কাপড় জড়িয়ে খুকী যাচ্ছে, আসছে। পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে চলছে। ব্রেসিয়ার মাপা। হাতকাটা পেটকাটা ব্লাউস। আর চুলগুলো কপালে কানে ঝুলছে। কাপড়ের ফাঁকে নাভি। বিশ্বামিত্রের উর্বশী যেন।

চুপ ! চুপ ! তুমসা নাহি দেখা।

ফির ওহি দিল লেহাল্ন।

কি খাসা চিজ ! আহা ! যন্তর মাইরি !

আহা ! কেয়াবাত ! কেয়াবাত !

তোবা ! তোবা !

ইয়া হো—মেরাদিল। মেরা পেয়ার।

ছেলেগুলো হেলেদুলে দাঁড়িয়ে গেল।

এই,···দুই,···তিন,···দুই···এক।

ইয়া···ইয়া···ইয়া···হো।

টিঙ্ক···টিঙ্ক···টিঙ্ক

মুঝে কই।

তিন···দুই··এক।

কোমর দুলছে। মাথা নড়ছে···চোখ ঘুরছে।

কোমব দুলছে। মাথা নড়ছে।

টিঙ্ক রাম, ইয়া-বিয়ার-টিঙ্ক-রাম, রাম টিঙ্ক। হুইসকি !

ভিয়েতনাম ! ইন্দিরা গান্ধী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমর দুলছে। পা-হাত হাত-পা। রাউণ্ড ও ক্লক। টুইষ্ট। সুবর্ণা—দুলছে। কোমর নাচছে। চোখ ঘুরছে। মিশর—জনসন—কোসিগিন—ইন্দিরা—কোসিগিন—ইন্দিরা—চীন—হাইড্রোজেন বম্ব। পৃথিবী ঘুরছে। মানুষ মরছে।

ইয়া—ইয়া—ইয়া···

নকশালবাড়ী, নকশাল, মাথা ঘুরছে। টুইষ্ট আও টুইষ্ট করে।

টিঙ্ক,···টিঙ্ক। টিঙ্ক। কেয়াবাত! তোবা! তোবা!

অবিনাশ কাত হল। আবার চিত হল। মাথা ঘুরছে। বুক ধড়ফড় করছে। তলপেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। অবিনাশ কাত হল। চিত হল। তারপরে হাঁটু ভেঙ্গে বসল। তাকাল। খোকন। খুকী —ছোট্টু। সুবর্ণার মুখ। সুবর্ণার বুকে কাপড় নেই। পুরান স্তন।

মাথা ঘুরছে। তলপেটে ব্যথা। ছোট্টুর হাত সুবর্ণার স্তনে।

কেয়াবাত! কেয়াবাত! মধ্যরাত।

অবিনাশ হামাগুড়ি দিয়ে খোকনের কিনার-কিনার দিয়ে এগোতে লাগল। একটা হিংস্র শ্বাপদ। একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার। হালুম, হালুম। ছোট্টুর হাত সুবর্ণার স্তনে। মাথা ঘুরছে। চোখ জ্বলছে। তলপেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। এক, দুই, তিন। তিন—দুই—এক।

টাইগার—রয়াল বেঙ্গল। হামাগুড়ি। অবিনাশ, অনেকদিন যায়নি। শার্দূল। বিকট গর্জন। অন্ধকারে এগোল। ঘর। অন্ধকার। ট্রাঙ্ক। সুটকেস।

সুবর্ণার ফ্যাকাশে মুখ।···

শিয়ালদহ, গোয়ালন্দ, ইলিশ, হিন্দুস্থান, সুবর্ণার ঢল ঢল শরীর। মাথা ঘুরছে। কোমর নাচছে, হাত নাড়ছে। পা দুলছে।

টিঙ্ক-টিঙ্ক। টিঙ্ক।

একটা বাঘ আর একটা যুবক সুন্দরবনে হাতাহাতি করছে। না —নাচছে। না মারামারি করছে।

এক-দুই-এক।

মাথা ঘুরছে, কোমর দুলছে, চোখ ঘুরছে।

কেয়াবাত! কেয়াবাত!

বাঘ আর মানুষ। মানুষ আর বাঘ ঘুরছে। আর ঘুরছে। মধ্যরাত ঘুরছে। ঘর ঘুরছে।

কেয়াবাত! কেয়াবাত!

তোবা! তো···বা······

৩ সোনার কাঠি রূপোর কাঠি

বাড়ী দুটো পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও দু বাড়ীর ভেতর যাতায়াত ছিল না। ফলতঃ মাঝখানে সবুজ লনের পাশে যে রাস্তাটা, তা সর্বদাই আবর্জনাময়। আন্তরিকতার হাত নিয়ে এগিয়ে এসে কেউ পরিষ্কার করতো না। ভেবেই পাওয়া যায় না পূর্বাপর এখানে যাঁরা বাস করেছেন কি ভাবে তাঁদের দিনরাত্রি শেষ হয়েছে!

এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীর জানালা দেখা যায়। ও বাড়ীর জানালায় পর্দার রঙ পলাশের মত লাল। অথচ এ বাড়ীর দরজা জানালায় কোন পর্দার বালাই নেই। শিবু বলে—"হাওয়া চাই। মুক্ত হাওয়া। সেই হাওয়া হু হু করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—সুখ—স্মৃতি। কেননা আমি নিজের সুখ চাই না। আমি বিশ্বাস করি ক্রমে ক্রমে সারা আকাশের মেঘ সরে যাবে।

পরিষ্কার নীল—ঘন নীল নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে দেখা যাবে। কেননা খণ্ড-বিখণ্ড বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত আলো ছায়াময় ধরিত্রী গোলাপের সান্নিধ্যে গিয়ে পৌছবে একদিন আর তখুনি কোন এক আশ্চর্য ছবি—আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, দুলে উঠবে। অবিরত দুলতে থাকবে।"

ভয়ে জড়সড় শিবু। না পারবে উঠে জানালাটা বন্ধ করতে। না পারবে কাউকে ডাকতে। একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরময় লুকোচুরি খেলে বেড়াবে হয়তো···

সেদিন অঝোরে বৃষ্টি। ধুলো ভরা বাড়ীর দেওয়াল জলের ধারায় একদম ফুটফুটে ফর্সা। শিবু দূরায়ত বৃষ্টির মধ্যে ইচ্ছার ফসল অনুসন্ধান করে। কারণ সে মাঝখানের ফাঁকটা অতিক্রম করে যেতে চায়।

মোহময় বাড়ীটার অন্দর মহলে রূপোর কাঠি সোনার কাঠি কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই লুকোন আছে। আর এমনি এক বৃষ্টি বাদলের

রাতেই তা খুঁজে বের করতে হবে। বস্তুতঃ সেই কাঠির ছোঁয়ায়ই প্রান্তরে ধান ফলবে। শিবুর দৃঢ় প্রত্যয়, এই সোহাগ মুখর ঘর সংসারে তেমন পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান নেই। তাই চড়ুই পাখিরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় চতুর্দিকে। পেট ভরে না ওদের। তাই কার্নিশে ছাদে-জানালায় সর্বদাই কিচির মিচির। দুঃখ হয়—ভারি দুঃখ হয় তার।

ভাবনার অন্ত নেই শিবুর। অথচ ও জানে ঘূর্ণায়মান এই মঞ্চে অন্ধকারের ক্লোজ আপ,—মারাত্মক শট্। তারপর ফ্ল্যাশ। আলোর ঝলকানি। তেমনি সামনের বাড়ীটার উজ্জ্বল রঙ একদা আর থাকবে না কিংবা বলা যায় আরো উজ্জ্বলতর হবে। এখানে এই হাওয়ায় সব —সবকিছুই সম্ভব। বিবর্তনের মধ্যদিয়ে কুয়াশার জাল ক্রমে, ক্রমাগত দূরে, আরো দূরে সরে যাবে, হ্যাঁ এটাই স্বাভাবিক।

শিবু ভাবে—আচ্ছা ওবাড়ীর ওদের কোন কিছুর কি দরকার হয় না! তেল, নুন এইসব। বাজারে যায় কখন! কে যায়! সেই রাজকন্যে! যে নাকি সোনার কাঠি রূপোর কাঠি আঁচলে বেঁধে রেখেছে। শিবুর কাছে সে—সে এক বিস্ময়!

শিবু ভাবে, যেমন করেই হোক ওই লাল পর্দাঘেরা বাড়ীটার সদর দরজায় পৌঁছতেই হবে। অথবা খুঁজে বের করতে হবে কোন গোপন দরজা। আর সেই বন্ধ দরজাটা ভাঙতে পারলেই দেখতে পাওয়া যাবে তার ইপ্সিত সমস্ত কিছু। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করে শিবু— "বৃষ্টি, তুমি খালবিল উজাড় করে তুফান বেগে ছুটে এসো। আমি তোমার সংগে ঐ নিষিদ্ধ দরজায় আঘাত হানবো।

রৌদ্র, তুমি সারা আকাশ নিয়ে নেমে এসো আমি ঐ বন্ধ দরজায় আঘাত হানবো।"

নাঃ, ভাবতে পারে না শিবু আর। কোন কথাও বলতে পারে না। তার জানালা দিয়ে দেখতে পায় একদা কেয়ারি করা সবুজ লনটায় আজ কি আবর্জনা। সেখানে চড়ুই পাখিগুলি কি রকম অসহায় ভাবে তাকায়—যেন কতকাল খেতে পায়নি। আহারে! কি কষ্ট ওদের।

অথচ ঐ বাড়ীটার মধ্যেই তো সেই সোনার কাঠি রূপোর কাঠি দুটো রয়েছে। বের করে আনতে পারলেই সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে। অবিশ্যি বের করে আনাটা যে খুব সোজা কথা তা নয়। কিন্তু বাবুই পাখিরা একদিনে বাসা তৈরী করে না, একটু একটু করে দীর্ঘ সময় নেয়, তবেই তো ঘর। যে ঘর ঝড় তুফানেও ছিঁড়তে পারে না। বৃষ্টিতে রোদে নষ্ট করতে পারে না। কারিগরি দক্ষতা—কি নিপুণ! শিবু—বোঝে না যে তা নয় তবে—ঠিক সেই রকমই একটা কিছু গড়তে চায়। কিন্তু সেই দক্ষতা কি করে অর্জন করবে সে! হয়তো বা ঐ পলাশ লাল পর্দাঘেরা বাড়ীটার মধ্যে যে রাজকন্যে আছে—সেই বলতে পারবে।

পাশে রাখা ক্রাচের দিকে তাকিয়ে ভাবে শিবু। এই সব ভাবনা ওকে দিশাহারা করে দেয়। কিছু না থাকার, কিছু না পাওয়ার যন্ত্রণাটা বুকের মধ্যে পাগলা কুকুরের মত চীৎকার করে ওঠে হঠাৎ। তৃষ্ণার্ত চোখে চারদিকে তাকিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাটটা দেখে। দেওয়ালে টাঙানো রঙীন ছবিখানা দেখে। কিনারে রাখা বুক সেলফে স্তরে স্তরে সাজানো বইগুলো দেখে। ওর কাছে ক্যালেণ্ডারের তারিখ-গুলো ধোঁয়াটে ধূসর বা বিবর্ণ নয়।

শিবুর ঘরে কেউ একটা প্রায় আসে না। আসে সকল বেলায় চা। দুপুর বেলায় ভাত। আর রাতে দুধ-রুটি। এর কোন হেরফের নেই। নিয়মে বাঁধা। সামনের ঐ বাড়ীটার মত নয়। কোনদিন ওদের দরজা খোলা দেখল না শিবু। কোন দিন মানুষ দেখল না ঐ জানালায়। শুধু পলাশ লাল পর্দায় হাওয়ার তরঙ্গই দেখল।

এই সব লুডোখেলা পাশাখেলা ভাল লাগে না শিবুর। কি হবে ছক্কা ফেলে। ঘুরে ফিরে নীল-লাল ঘর পেরিয়ে যে জায়গায় ছিল—সেই জায়গায়ই ফিরে যাওয়া। এসব যে জানে না সে তা নয়। জেনেশুনে সকলেই যা করে তাই করে যেতে হয়! কিন্তু আর সহ্য করতে পারছে না সে। সেই সকাল—সেই সন্ধ্যা, যা কিনা মনে

হয়—সে অনেক, অনেকদিন আগেই পেরিয়ে এসেছে।

শিবু, জানে একদিন ঐ বাড়ীটা আর নীরব থাকবে না। চড়ুই পাখিরা, বাবুই পাখিরা সকলে মিলে তৈরী করবে এক নীড়। সুখের জন্যও হতে পারে। দুঃখের জন্যও হতে পারে। কিন্তু কি হবে না হবে ভেবে আর চুপচাপ থাকা যায় না। কেননা ঐ বাড়ীটার ভেতর একলা সেই রাজকন্যেই শুধু বাস করবে তা হয় না—হতে পারে না।

শিবু নিজের ঘরের দিকেই আবার চোখ ফেরায়। সেখানে শূন্যতা —নিবিড় শূন্যতা। বাড়ীতে যে লোকজন নেই তা নয়। মা ছাড়া আর সকলেই রয়েছে। কিন্তু স্নেহ-প্রীতি প্রেম, দেওয়া নেওয়ার আন্তরিক সম্পর্কগুলি কবে যেন, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখন সেসব আবার ফিরে পেতে চাইলে হয়তো পারে সে কিন্তু কেবল সেই সোনার কাঠি রূপোর কাঠির ছোঁয়াতেই। তা সে কি ভাবে সংগ্রহ করবে তবে? শিবুর মাথার মধ্যে কেবলি সেই চিন্তা ঘুরপাক খায়। জানালার আকাশে কয়েকটা ঘুড়ি কি সুন্দর ভাবে খেলে—খেলে বেড়ায়।

শিবু নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না। ক্রাচটা নিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপে তার। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না সে। আর তখনই সেই রাজকন্যের কথা—আরো বেশী করে মনে পড়ে তার। তার সোনার কাঠিটা ছোঁয়ালে নিশ্চয়ই শিবুর ছোট পাটা অন্যটার সমান হয়ে যাবে। আর তা হলেই তো রোদে বৃষ্টিতে ধানক্ষেতে সে ইচ্ছের ফসল ফলাতে পারবে।

এমনি—এক দুপুরবেলা ঝলমলে রোদের দিন অঝোরে বৃষ্টি নামল। কোথা থেকে ছুটে এল মেঘ। কালো হয়ে গেল আকাশ। কোথায় যেন দারুণ শব্দ করে বাজ পড়ল। বিদ্যুৎ চমকাল। মনে হল পাশাপাশি দুটো বাড়ী যেন ভীষণ সংঘর্ষে চুরমার হয়ে গেল। ভাঙ্গলে মন্দ হয় না কিন্তু। আসলে শিবু তাইই চায়। সেই জমিতেই তো তৈরী হবে আবার নতুন বাড়ী। তার ইচ্ছের নতুন ফসল।

একটানা গরগর শব্দ উত্তর থেকে পশ্চিমে এল—গেল। জানালা দিয়ে দমকা বৃষ্টির ছাট এসে ঢুকছে। ঘরে এলোমেলো হাওয়ার ছুটোছুটি। এই মাঝ আশ্বিনে বৃষ্টিটা এত প্রবল জোরে এল। তবে কি সামনেই সেই চূড়ান্ত সময়! শিবু ক্রাচটা হাতে নিল। ধীরে ধীরে, খুব সাবধানে নিচে নামতে লাগল। কেউ কোথাও নেই। কেউ বাধা দিল না।

দরজা খুলে সবুজ লনের রাস্তাটায় নামলেই সামনে সেই পলাশ লাল পর্দাঘেরা বাড়ীটা। কি জোর বৃষ্টি! মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক। জামা-কাপড় ভিজে একসা। হাওয়া যেন উড়িয়ে নিতে চাইছো। বৃষ্টির বাণ ডেকেছে যেন, প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল আবার। চারপাশে গম-গম আওয়াজ। পলাশ লাল পর্দাঘেরা বাড়ীটা তোলপাড়। থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত পৃথিবী। চার পাশে গমগম আওয়াজ···গমগম আওয়াজ···গ ম গ ম আ ও য়া জ··· চারপাশে···প লা শ লা ল···

* * * *

অতিকষ্টে রাস্তাটা পার হল শিবু। দিনের বেলা যেন রাত হয়ে গেছে। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুতের ঝিলিকের আলোয় চোখ ঝলসে গেল। সেই আলোয় বাড়ীটার গায়ে কোন রকমে হাত রাখল সে। তারপর হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে দরজার কাছাকাছি জায়গায় এসে হোঁচট খেয়ে সশব্দে পড়ে গেল।

সহসা শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল—মানে ভেঙে গেল। ঝুর ঝুর করে একরাশ বালি চূন ইটের টুকরো পড়ল। আর—তক্ষুণি হাওয়া আর বৃষ্টি একই সংগে হু—হু করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

• দর্পণে সংগ্রামের মুখ

কারখানায় ধর্মঘট চলছিল।

সরমা নিজে জানে না কি করে সংসার চলবে। কেন না পরিমল একে গোঁয়ার, তার ওপর মজদুর ইউনিয়নের পাণ্ডা। সে সহজে কাজে যোগ দেবে না। হাতে যে ক'টা টাকা ছিল তা প্রায় শেষ। এখন একমাত্র ভরসা সেলাইকল ও দর্জির কাজ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সরমা অর্ডার সংগ্রহ করে। মেয়েদের ফ্রক, ব্লাউজ ইত্যাদি ভালই করে এবং সযত্নে ঠিক সময়ে দেয়। সেইজন্য অর্ডারের অভাব হয় না। ভাগ্যিস বিয়ের আগে এই কাজটা সখ করে শিখেছিল। বর্তমানে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, না হলে যে কি হত তা ভাবতে পারে না। আত্মবিশ্বাস আর মিষ্টি স্বভাব তাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখে নি—চারজনের ভাতও যোগাচ্ছে। অবিশ্যি রাত-দিন পরিশ্রম করে সরমা। তবুও এই কষ্টের জন্য আফশোষ নেই।

পরিমল অলস বোকা লোক নয়—চলনে-বলনে। রীতিমত স্মার্ট। শ্রমিকদের প্রতিনিধি। আর ঐ হচ্ছে সর্বনাশের কারণ। এখন শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ মালিকপক্ষকে জানাতেই হবে। দায়িত্বটা তো কম নয়। লেখাপড়া জানা শ্রমিক-দরদী পরিমল ব্যতীত আর কে আছে। জ্যামিতির উপপাদ্যের মত সহজ না হলেও, এক্ষেত্রে সহজ। শ্রমিকদের কিসে ভাল হবে, এই চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাকে। নিজের জন্য, সংসারের জন্য কোন ভাবনা নেই। কারখানা-শ্রমিক ওর কাছে বড়। অবিশ্যি এই নিশ্চিন্তে থাকার জন্য কতকটা সরমা নিজেই দায়ী। নিজের কাঁধে সম্পূর্ণ ভারটা নিয়েই ভুল করেছে। বিপদ-আপদ, ঝড়-ঝাপটা সব সরমার ওপর।

এত দ্রুত যে একটা সংসারে ওলট-পালট হবে, এ ধারণা পরিমলের

ছিল না। মালিকপক্ষ দীর্ঘদিন ধর্মঘট জিইয়ে রাখতে বিস্মিত হল। সময় চলে যাওয়ার ফলে দিন দিন সরমার মুখটা গম্ভীর হতে থাকে। কারোর সংগেই তেমনভাবে কথা বলে না। চুপচাপ নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত।

বাড়িতে বসে পরিমল সরমার মুখের দিখে তাকিয়ে ভাবে সেই ফেলে আসা গ্রামের কথা। প্রাইমারি স্কুলে একটা সামান্য মাস্টার ছিল। নদীর কিনারে গাছ-গাছালিতে ঘেরা একটা ছোট্ট বাড়ি ছিল। চারিদিকে উপচে পড়ছিল সুখ-আনন্দ। কিন্তু অত সুখ কপালে সইল না। হঠাৎ সবকিছু যেন চলে গেল। বাড়িঘর, মানুষজন চিরদিনের মত চলে গেল। সকলের মত তাকেও স্রোতের টানে ভেসে এসে ক্যাম্প-জীবন নিতে হল।

সংগ্রামের সিঁড়ি অতিক্রম করার পর একটা কলোনীতে একটু জমি পেল। মাথা গোঁজবার মত বাড়িও হল। এর পর কারখানায় এই চাকরি। ক্রমে ক্রমে নতুন কর্মক্ষেত্রে সে প্রতিষ্ঠিত হল। পরিমলে চেষ্টায় কলোনীতে সমবায় সমিতি গড়ে উঠল। লোকের সুখ-সুবিধা সে করে দিয়েছে বলে না, তবে তাদের সঙ্গে নিজেও অক্লান্ত খেটেছে। কলোনীটাকে সুন্দর সুশ্রী করার জন্য, এখানকার লোকের সুখ-সুবিধা আনার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। ব্যাপারটা ছিল আন্তরিক।

ওদের ঘরে ইতিমধ্যে তু'টি সন্তান এসেছে। ছেলে পান্না, মেয়ে ঋতু। সরমা এদের নিয়ে কত আনন্দে ছিল। রাত্রে ছেলে-মেয়েদের রূপকথা শোনাত। পরিমলও সেই গল্প শুনে ভাবত, একদিন এই সংসারে এক অভাবনীয় পরিবর্তন আনবে। ছেলে-মেয়েদের মনের মত ক'রে মানুষ করবে। এই কঠিন সংসার প্রাঙ্গণে তুঃখ-দৈন্যের দৈত্য-দানবকে পরাজিত করে নিজে বাঁচবে, এদের বাঁচাবে। কিন্তু আজ সে ক্ষত-বিক্ষত। তবে মনে জোর হারায় নি। সে যুদ্ধ করবে শেষ পর্যন্ত। সংগ্রামই তঃ জীবন।

সরমা ভাবে ধর্মঘট কতদিন চলবে। কেনই বা ধর্মঘট। মালিকের সঙ্গে ক্ষুদ্র শক্তি শ্রমিকেরা কতদিন যুদ্ধ করবে। কে বোঝাবে কাকে। দু'পক্ষের ব্যাপার। সরমা পরিমলকে বোঝায়, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া কি আমাদের মত চুনোপুঁটিদের চলে? কে শোনে কার কথা। এক পক্ষকে একটু নরম হতেই হবে। অবিশ্যি বিচার যেন নীতিসঙ্গত হয়। এখানেই ত' প্রশ্ন। সর্বত্রই জোর যার মাটি তার। আগে ছিল রাজার জোর—এখন হয়েছে সরকারের। ধনী লোকদের জন্যই যেন সরকার। মালিক যদি একেবারে কারখানা বন্ধ করে দেয় ত' কি হবে? সেলাই করে কোনরকমে ছেলে-মেয়েদের বাঁচিয়ে রেখেছে। আর যাদের কোন কিছু অর্থকরী কাজ জানা নেই, তাদের কি হবে। পরিমলের উপর রাগ হয়। রাগে গজগজ করে সরমা।

আবার ভাবে, পরিমলের কি সব দোষ? হয়তো এই ধর্মঘট করতে বাধ্য করা হয়েছে। অশান্তি যাতে না হয়—আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিলেই ভাল হত। আজ আসুক বাড়ি। কোথা থেকে রোজ ভাত আসে, তা জিজ্ঞেস করবে। মনে মনে ভীষণ জ্বলতে থাকে। কে তাকে পরামর্শ দিয়েছে এই দুঃখ-দুর্দশা আনতে। সকল অলঙ্কার এক এক করে কেন বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। আর নয়, পরিমলের অনেক লম্বা লম্বা বুলি সে শুনেছে। সকলের দুঃখ দেখলে চলবে না। নিজে মরে যাচ্ছে তা কে দেখছে। ইউনিয়ন! পোস্টার মারবেন। মিছিল করবেন। বক্তিমা দেবেন। এই যদি করার ইচ্ছে ছিল, বিয়ে না করলেই হত। দেশের কাজ করেই বেড়াকগে। কারোও কিছু বলার থাকবে না। এদিকে হাঁড়িতে চাল নেই—দেশের সেবা। লেখাপড়া শিখে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। পোড়াকপাল!

শ্রান্ত পায়ে দুপুরে বাড়ি এল পরিমল। ইতিমধ্যে সরমা কোনরকমে চাল যোগাড় করে উনুনে চড়িয়েছে। আজ শুধু ভাতে ভাত ছাড়া আর

কিছু হবে না। পরিমলকে দেখে সরমা চেঁচিয়ে বললে : এতক্ষণে বাবুর সময় হল ? বলি কি করে সংসারটা চলে—খোঁজ-খবর রাখ !

পরিমল থতমত খেয়ে গেল। সরমার তো অত রাগ হয় না কোনদিন। আজ আবার কি অঘটন ঘটল। বুঝতে পারল আজ নানা প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিতে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাঙা চেয়ারটা টেনে এনে শক্ত করে বসল এবং সহজভাবেই উত্তর দিল : জানি তুমি এই সংসার আর বহন করতে পারছ না। কিন্তু কি করবো বল ? আমি কি ইচ্ছে করে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি ! এ সময় অধৈর্য হলে চলবে না।

সরমা কথার উত্তর দিতে গিয়ে চোখটা মুছে নিল, অজান্তেই চোখে জল এসে পড়ছিল। নিজেকে সংযত করে বললে : কেন এই ঝঞ্ঝাট নিতে গেলে। কতবড় দায়িত্ব তুমি নিয়েছ জান ? কারখানা আর না চললে, তোমার জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। আবার শুনছি কোম্পানির দালালরা সবাইকে ঘুষ দিয়ে কাজ করতে প্রলোভন দেখাচ্ছে।

: বাজে কথায় কান দিও না। পরিমল ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইল।

পরিমল বুঝতে পারছে সরমা সব কিছু বোঝার চেষ্টা করছে। যদিও অসহিষ্ণু ও ধৈর্যহারা হয়েছে, সহানুভূতি আছে। কেন না এর আগে বহুবার বুঝিয়েছে। দিন দিন বাজার বাড়ছে। সংসার চালানো কষ্টকর ব্যাপার। এর পরে আছে চিকিৎসা, স্কুল। এই সব অভাব-অভিযোগ সরমারও অজানা নয়। সেই জন্যেই রেগে গেলেও তেমন-ভাবে কিছু বলে না।

কলোনীর পাশে শুধু কারখানাটা নয়। পাশে রয়েছে একটা বস্তি। এই বস্তিতে থাকে অবাঙালী অনেক মজুর। এই ধর্মঘটের জন্য কেউ কেউ দেশে চলে গেছে। কেউ অন্য স্থানে ঠিকা কাজ করছে। কিন্তু যারা কোন কিছুই জোটাতে পারে নি, তারাই পড়েছে

বিপদে। এখন এই অকর্মণ্য লোকেরা পেটের দায়ে চুরিচামারি করবে, এ আর অসম্ভব কি? আবার ধৈর্যহারা হয়ে কোম্পানীর দালাল হবে, এও অসম্ভব নয়।

কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবে নির্ধারিত কিছু সংখ্যক কর্মীকে নিয়ে প্রথমে কারখানা খোলার সর্তে ইউনিয়ন রাজী হল। এ ছাড়া উপায় ছিল না। শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমেই অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল। অবিশ্যি মালিকপক্ষ দাবীদাওয়ার ব্যাপারে সন্তোষজনকভাবে সুরাহা করবে কথা দিয়েছে। পরিমল দেখল মান থাকতে এই প্রস্তাবে রাজী না হলে ভাঙন ধরবে। দীর্ঘদিন ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। আবার কারখানা খুললে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। নিজেদের ঐক্যও অটুট থাকবে। পরিমলের কাছে দুনিয়াটা শুধু লড়াই আর কিভাবে নিজেরা ঠিকমত একতাবদ্ধ থাকবে ভাবনাটা এই নিয়ে ঘুরছিল। তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে ভেবে যেন শান্তি পেল। সরমাও বিরক্ত করছিল।

প্রফুল্লমনে বাড়ির উঠানে পা রাখতেই সরমা টিয়াপাখির মত চোখ ঘুরিয়ে এক পলক পরিমলের দিকে তাকিয়ে মুখটা নিচু করল। সেলাই মেশিনটা জোরে চালাল। চোখে-মুখে হাজার বিতৃষ্ণা। অবহেলার ভাব। সে যেন এ বাড়ির কেউ নয়। সে যেন ফালতু লোক। খেল না খেল কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। এই বুঝি সংসারের নিয়ম। টাকার সঙ্গে সকলের সম্পর্ক। হাত-পা ধুয়ে খেতে বসল পরিমল। সরমা কল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল: আসার সময় হল? গলার স্বরটা বিকৃত শোনাল।

পরিমল এ সব কিছু গ্রাহ্য না করে সহজভাবে কথাটা পাড়ল: কাল কারখানা খুলবে।

: কি বললে? তা আমি বুঝেছি আমার হাড়-মাস না খেয়ে তোমার শান্তি নেই। কারখানা খুলবে কতবারই তো বললে।

: খুলবে, খুলবে এবার দেখে নিও। কথার ফাঁকেই বাড়া ভাত

টেনে নিয়ে পরিমল গোগ্রাসে গিলতে লাগল। কথাটা সরমা এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। কেননা পরিমল এমন কথা বলে আগে বহুবার সান্ত্বনা দিয়েছে। হাতের কাজটা বন্ধ করে পরিমলকে উদ্দেশ্য করে বলল : গোবিন্দদের বাড়ি থেকে কাপড়টা নিয়ে এস। বলেই নিজের কাজে মন দিল। যাকে বলল সে একমনে ভাত খাচ্ছে। মুখ তুলে মায়া হল সরমার। কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে। হবেই বা না কেন? সময়মত খাওয়া নেই, স্নান নেই, ঘুম নেই।

তাড়াতাড়ি উঠে সরমা আরো দু মুঠো ভাত দিল। পরিমল সঙ্গে সঙ্গে বলল : না না না আর নয়। তুমি খাবে কি? সরমা কোন কথা শুনল না। পরিমল কিছুটা খেয়ে উঠে পড়ল। কোনরকমে হাত ধুয়ে পরিমল চলে যাচ্ছিল দেখে সরমা ডাকল, বলল : আঁচলে টাকা রয়েছে নিয়ে যাও। ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে এস।

পরিমলের ফেলে-যাওয়া ভাতগুলি দেখে সরমার চোখে জল এল। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। মানুষটা যেন কেমন হয়ে গেল। অথচ এরকম ছিল না। সাধ-আহ্লাদ ছিল। রঙ্গ-তামাসা ছিল। কিন্তু আজ আর যেন কিছু নেই। সংসারের ঝামেলায় এবং কারখানার পরিবেশে মানুষটা মেশিন হয়ে গেছে। আর এই ধর্মঘটের জন্য সংসারের প্রতি নিস্পৃহ হয়েছে আরো বেশি। রাতদিন ভাবে। সভা-মিছিল নিয়ে মেতে আছে। আগে কারখানার কত গল্প করতো। ক্যান্টিনে কি রান্না হল। কার প্রমোশন হল ইত্যাদি কত বিষয় নিয়ে কত কথা বলতো। ছুটির দিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে গড়ের মাঠে, কখনো চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যেত। মাঝেমধ্যে সিনেমায় যেত। এখন যেন সব পাল্টে গেল। কেন? সে কথার জবাব খুঁজতে গিয়ে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই উঠে পড়ল সরমা। সন্ধ্যার আর বেশি দেরী নেই।

পরিমল বেশ একটু রাতে বাড়ি ফিরে দেখল—সরমা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে মেশিনটা চালিয়ে যাচ্ছে। অল্প আলোয় সরমার মুখটা করুণ দেখাচ্ছে। পরিমল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল : জান, কাল কারখানা খুলবে। পাকাপাকি কথা হয়ে গেল।

: সত্যি। সরমার চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাল।

: হ্যাঁ, কয়েকটি সর্তে। কিস্তিতে কিস্তিতে লোক নেবে। বলেছিলাম না আমরা জিতবো। কি জানো—একতাই শক্তি।

: তোমাকে নেবে তো ?

: কেন এ কথা বলছো।

: তুমি যে লিডার।

: মেশিনটা বন্ধ কর। কোথাকার যমদূত !

: এটা ছিল বলেই বেঁচে ছিলে—অবহেলা করো না।

: রাখ দিকিনি।

: তুমি খাবে না।

: না, একগাদা খেয়ে এসেছি।

: কে খাওয়ালে ?

: শ্রমিক ভাইরা।

অনেকদিন পর প্রাণ খুলে দু'জনে কথা বলল। কথা বলতে বলতে রাত্রি গভীর হয়ে গেল। কি মনে করে পরিমল হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে গ্রাস করে নিল সব এক মুহূর্তে। পরেই জ্যোৎস্নার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। পূর্ণিমা কাছেই হবে। আকাশে তারারা ঝলমল করছে। দূরের গাছ-গাছালিতে জোনাকিরা জ্বলছে-নিভছে। দূরে কোথাও বস্তিতে গানের জলসা বসেছে। তার সুরের মূর্ছনা এখানেও ভেসে আসছে। দীর্ঘদিন পর সংগ্রামী মুখগুলো আবার খুশিতে মশগুল হচ্ছে। পরিমলের ভাল লাগল। গুনগুন করে একটা গান ধরল সে। সরমা চুপ করে বসে রয়েছে।

চাঁদের আলোয় সরমার মুখটা যেন আগের মতই মিষ্টি লাগছে। টানা টানা চোখ দুটো আজ আবার পরিমলকে আকর্ষণ করছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সরমা বললেঃ কারখানা খুললে যে টাকা পাবে—আমায় দেবে?

ঃ কি করবে?

ঃ রেডিও কিনবো।

ঃ আচ্ছা।

কথায় কথায় চাঁদ গাছের মাথায় নেমে এসেছে। পরিমল সরমার হাত ধরে ঘরে নিয়ে এল।

ধর্মঘটের পর কারখানা খুলেছিল।

বিরাট লোহার গেট দিয়ে কর্মীরা ঢুকছে। অদূরে একটা পুলিশভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদল শ্রমিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্লোগান দিল—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। আজ যারা ঢুকছে তাদের মধ্যে শুধু কার্যকরী সমিতির সদস্য ব্যতীত সকলেই রয়েছে। পরিমলের কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু সহসা কিছু করতে মন চাইছিল না। সকল শ্রমিক ঢুকে গেলে দারোয়ান একটা লিস্ট গেটে মেরে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ করে দিল।

পরিমল ও ইউনিয়নের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখে কোম্পানী কার্যকরী সমিতির সবাইকে বাদ দিয়ে কারখানা চালাবার জন্য সদম্ভ ঘোষণা করছে—অনির্দিষ্টকালের জন্য নিম্নলিখিত শ্রমিকদের কর্তৃপক্ষ পুনর্বহাল দিতে অক্ষম। নোটিশটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ লোহার গেটে সজোরে ঘুষি মারল। কয়েকজন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। শোকের ছায়া নেমে এল। পরিমল হতভম্ব হয়ে গেছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে তার। শরীর কাঁপছে। কারখানাটা চোখের সামনে ঘুরছে। কিছুই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে। কারখানার হুটার পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে পরিমল হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিল—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। আর তক্ষুণি মন্ত্রবলে যেন সকলে পরিমলের পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সকলে শ্লোগান দিল—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে। ধাপ্পাবাজি চলবে না—চলবে না। বিশ্বাসঘাতক, বেইমান—জবাব দেবো—জবাব দেবো—

চিমনির ধোঁয়া—বন্ধ লোহার গেঠের সামনে তারা এই বেইমানীর জবাব দেবার শপথ নিল।

● এই এখন

সামনের গঙ্গা বিস্তৃত নয়। ওপারের ঘাট-শহর স্পষ্ট দেখা যায়। চারপাশে নিরিবিলি শান্ত পরিবেশ নয়—হাজারো ব্যস্ততা নিয়ে নৌকা লঞ্চ যাচ্ছে—আসছে। অল্প স্বল্প মাঝারি লম্বা ঢেউ পিছল ভাঙ্গা সিঁড়িতে আছড়ে পড়ছে।

আমি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে শ্রীকান্তের শ্মশান খুঁজছিলাম। সেই নিশুত রাত—গা ছমছম শিহরণ। আশ-শ্যাওড়ার ডালে হুতোম পেঁচার ডাক…

এইসব অনুভূতি আজ আর ভাবা যায় না। শরৎচন্দ্রের গ্রাম-বাংলা বহু যোজন পিছনে ফেলে চলে এসেছি। ট্রাম-বাস পাইপগান বোমা নিয়ে ঘর করি এখন।

এখন রক্তের ঢল বসুধা বিভক্ত।

শহরের শ্মশান ঘাট হলেও এখনো ইলেকট্রিক চুল্লি হয়নি। ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। শ্মশান চত্বরে মাঝে মধ্যে উচ্চরোলে কেউ কেউ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে। অথবা কেউ বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে। প্রশ্ন শুধু একটাই? একি হল? এমনতো—হওয়ার কথা ছিল না। আমার চোখেও জল নেই। সমস্ত বোধ বিলোপ হয়ে যাচ্ছে। আমি যেন মরুভূমি প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আলোর পাখি খুঁজছি। কেননা সেই পাখি হয়তো বা আমার রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারবে। কিংবা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুই।…আমি বেঁচে আছি না মরে আছি কিছুই বুঝতে পারছি না অথচ চোখের সামনেই দেখছি গঙ্গা কুলুকুলু গর্জন করে বয়ে যাচ্ছে, মানুষ পারাপার হচ্ছে।

অমল বিমল এখন সাদা কাপড়ে ঢাকা। না, গা থেকে চাদর

খোলা যাবে না। বীভৎস! শরীরের কোন জায়গা অক্ষত নেই। বিমলকে চেনা যায় না, অমলকেও।

আমরা দীর্ঘদিনের বন্ধু। একসঙ্গে বড় হয়েছি। একসঙ্গে স্কুলে গিয়েছি, খেলেছি। পাড়ায় রটে গিয়েছিল—থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। আমি এখন একা। অথবা বলা যায় আমি নেই। সাধ ছিল অনেক কিন্তু কিছুই হল না। সব ছারখার হয়ে গেল। অমল বিমল বলেছিল—তিনজনে একটা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াব। সেই কল্পতরু, সেখানে আমাদের ইচ্ছের ফুল ফুটবে, আলোর পাখি আসবে। আমি বলেছিলাম তাই হবে।

কোন ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে নয়, অনেক ভেবেচিন্তেই আমরা ঠিক করেছিলাম, গ্রামে যাবো। চাষবাস করবো। আসল কাজ তো ওখানেই।......

'তোমার ক্ষেতের শস্য যারা চুরি করে গুপ্ত কক্ষেতে জমায়' ইতিমধ্যে তাদের চিনতে শিখেছি। অন্তত এটুকু পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সেই লোভের হাতগুলো ভাঙতে হবে এবং শহর নয় এবার মেঠো পথেই পা বাড়াতে হবে। শুধু কাজে নামাই বাকি ছিল।......

কিন্তু সবই শেষ হয়ে গেল। আমাদের মাঠ, সেই গাছ। সেই আলোর পাখির খোঁজ করা আর হল না। তার আগেই অমল আর বিমল শুরুতেই খেলা ভাঙল। একা—দাঁড়াবার মত শক্ত পা আমার নেই। পায়ের নীচে বিশ্বস্ত মাটিও এখন টাল খাচ্ছে।

দু'বছর কলকাতায় ছিলাম না। ক্বচিৎ কখনো এলেও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিলই না বলা যায়। বাইরে থেকে নানা খবর পেলেও বুঝিনি কলকাতা এ্যাতো পাল্টে গেছে, আমাদের সেই পাড়াকেও এখন চেনা যায় না; এমন কি অমল বিমলকেও

না। এতটুকু তো এলাকা, তার মধ্যে আবার নানান জোন। অমল একটিতে। আবার সবে দলছুট বিমল অন্যত্র। আমার ভাল লাগেনি। এরকম তো কথা ছিল না। ঠিক করেছিলাম দুই পারে দাঁড়িয়ে থাকা অমল বিমলের মধ্যেকার ভাঙ্গা ব্রীজ জুড়ে দেব।

একদিন ভোরবেলা দারুণ হৈ চৈ। বোম চার্জ। দুরুম-দাড়াম আওয়াজ। মনে হচ্ছিল বসতবাড়ি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। সবে মাত্র সকালবেলার আলো নেওয়ার জন্য জানালা খুলেছিল লোকে—খটাখট শব্দে তা ফের বন্ধ হয়ে গেল। ঘুম-ঘুম চোখে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি—দু'দলে লড়াই হচ্ছে। আধুনিক কুরুক্ষেত্র। হঠাৎ গোল-মালের মধ্যে কে বা কারা যেন বললে—ওরা অমলকে ছুরি মেরেছে। ইচ্ছে ছিল কাছে গিয়ে দেখি কিন্তু ভীড়ের মধ্যে আমার আর যাওয়া হল না। রক্তাপ্লুত অমলকে ধরাধরি করে এ্যাম্বুলেন্সে তুলছে ওরা। আমার মাথা ঘুরছিল পা টলছিল।

বিকেলবেলায় শববাহকদের সংগে শ্মশানে এলাম। অমলকে চিতায় শোয়ান হলে ঘাটসিঁড়িতে বসলাম। সামনেই সেই গঙ্গা কুলকুল গর্জন করে বয়ে যাচ্ছে—পারাপার হচ্ছে লোক। একপাশে চিতার নীল শিখা—অন্যপাশে চাপা উল্লাস। কারা যেন বললে তিনটে লাশই পড়েছে। বিমলটাও হাসপাতালে—বোধহয় বাঁচবে না। অদূরে বদলা নেওয়ার স্লোগান শোনা যাচ্ছে। এই দুইয়ের মাঝখানে আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লেভেল ক্রসিং'-এর নায়কের মত।……

আমার চোখের সামনে এখন ভাসছে শ্মশান চাতালে পাশাপাশি শোয়ানো সাদা চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা আরও দুটি শবদেহ। ভেবেছিলাম দুইটানে সেই চাদরগুলো সরিয়ে একবার দেখবো। কিন্তু পারিনি, ভয় হোল। চাদর সরালেই কি দেখবো ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে—একজনের চোখে ক্রোধ, অন্যজনের চোখে—ঘৃণা?

• কাঁটা তার

ছবিটা ওলট-পালট করে দেখছিলাম। মন বিষণ্ণ হলে ছবিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখি। ক্রমে ক্রমে শান্তির ছায়া দেহ-মনে ছড়িয়ে যায়।

ছবিটা মাতৃভূমির। চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে এসেছি আর কোনদিন দেখতে পাব না। এখনো মনে হয় কত কাছের, কত আপন, কত প্রিয়।

সেই দেবদারুগাছ! আম-হিজলের বন। ধান-জমি, কচুরিপানায় ভরতি পুকুর। শাপলা পাতার ঢেউ। কলমি লতায় ফড়িং। আর —আর কলাগাছে ঘেরা শণের ঘর।

মাথার ওপরে নীলকণ্ঠ আকাশ। টুকরো-টুকরো শুভ্র মেঘ, পাহাড়-পাহাড় মেঘ।

দূরে-অদূরে যৌবনে ঢল-ঢল ধলেশ্বরী গাঙ। আহা রে! কতকাল দেখি নি। স্মৃতির পর স্মৃতি ভিড় করে। চোখে বর্ষার ঢল নামে। সমস্ত দেহে ককিয়ে ককিয়ে একটা যন্ত্রণা।

খণ্ডিত হৃদয়ে সাপের ছোবল কাঁটা তার ডিঙিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আঘাত দেয়। দংশনে-দংশনে সারা দেহ অঙ্গার করে ফেলে। রক্তকণিকা নীলবর্ণ হয়ে যায়।

তখনি গ্রামের ছবিটা বুকের ভিতর থেকে বের করে, সোজাসুজি-ভাবে, তেরছাভাবে উলটিয়ে-পালটিয়ে দেখি। কিছুটা তৃপ্তি মনের মণিকোঠায় গড়িয়ে গড়িয়ে যায়।

কি পেলাম স্বাধীনতায়? স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজের গ্রামের ছবিটা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। দেশ, বিদেশ হল। অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল।

কেউ প্রতিবাদ করলো না। রুখে দাঁড়াল না। নিজের,—নিজেদের ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়ে গেল। একজন বলে—অমুক মন্ত্রী হবো। আর একজন বলে মুকুট-তরবারি চাই। কেউ দেশের কথা তলিয়ে দেখল না। চিন্তা করলো না। না—কেউ না।

আর একদল চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করতে দ্বিধা করলো না। সবকিছু···সবকিছু ফেলে পালাতে লাগল। দলে-দলে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভাবল না। বাস্তুহারা, উদ্বাস্তু কথাগুলি লেবেল এঁটে, নিজেদের ধর্ম, নিজেদের ইজ্জত বাঁচাতে চাইল।

গ্রামে-গ্রামে খবরটা মুহূর্তে সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে গেল। ছোট বড় সকলের মুখে—চলো—স্বাধীন দেশে চলো।······

এই পরিকীর্ণ ধানক্ষেত। সোনালি সবুজ ধান। ঢেউয়ের পরে ঢেউ ভাঙা নদী। আঁকাবাঁকা সরু খাল। সবুজ—বনানী-ঘেরা বাড়ি। মাঝে-মধ্যে ডোবা-পুকুর। সব—সবকিছু ফেলে চলে যেতে হবে—বহুদূরে। সুতরাং মায়া-মমতা ত্যাগ করে শূন্য কলসী কাঁখে চলো। কেন না আমাদের বলতে এখানে আর কিছুই থাকবে না। জন্মভূমিতে আজ আমরা পরাধীন।

অর্থবহ কথাগুলি শুনতাম,—বুঝতাম না। কতই বা বয়েস। বড়জোর নয়-দশ বছরের কিশোরী। কথাগুলি না বুঝতে পারলেও সকলের চোখেমুখে আতঙ্ক! হতাশা! এবং গ্রামে জুজু পড়েছে, তারই ভয়ে সকলে চিন্তিত, বুঝতে অসুবিধা হত না।

চোখের সামনে এখনো সেই দৃশ্যাবলী। মনে হয় এই সেদিন—সেই নারকীয় পৈশাচিক ঘটনা ঘটে গেল।

আগুন। দাউদাউ আগুন। দেবদারুগাছ ছাড়িয়ে লকলকিয়ে আগুনের ফণা আকাশে নাচছে। কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে সবুজ গাছগুলি গ্রাস করছে। সমস্ত আকাশটা লালে-লাল।

হৈ-হট্টগোল ! চীৎকার। কান্নার শব্দ। বাঁচাও-বাঁচাও। মেরে ফেলল। মরে গেলুম। আ—উঃ মাগো-বাবাগো বাঁচাও। পালাও। পালাও। চীৎকারের সোরগোল। কে যেন বলল ঃ ধলেশ্বরী গাঙে রক্তের ঢল। ঘোড়ামারা গ্রামের কেউ বেঁচে নেই। সব খতম। পালাও নিরাপদ দেশে পালাও।

মা আমাকে কোলে নিয়ে কাঁপছে। অস্ফুট গলায় হরিনাম জপছে। বাবা একটা লাঠি নিয়ে দুয়ারে দাঁড়াল। গ্রামের যুবকেরা ছোটাছুটি করছিল।...

শেষ দৃশ্যে আবদুল আজিজের বীরত্বে সে যাত্রা গ্রাম রক্ষা পেয়েছিল।

সে যাত্রা মানরক্ষা হলেও দেশের সংসারে যে ভাঙন ধরলো আর থামলো না। তা ক্রমশ বাড়তে লাগল।

ঘরবাড়ি জমি-জিরাত ফেলে নিরাপদ ভূমিতে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল। মান রাখতে, স্বাধীন হতে সীমানা ছাড়িয়ে জলঘূর্ণি নদীতে নৌকা ভাসাল।

বিপদ-সংকুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শীত-বসন্ত এল গেল। জল্পনা-কল্পনার দিন অতিক্রান্ত হলে হ্যারিকেনের আলোয় রাত্রি ভোর হত। সকলের মনে প্রশ্ন—কি হবে, কোথায় যাবে। ওখানে গিয়ে কিভাবে সংসার চলবে।

শেষ নৌকায় পা নেবার দৃশ্য এখনো জ্বল জ্বল করছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরের মেঝেয় মা, বাবা বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বাবা বলছেন ঃ শান্তিকে পাঠিয়ে দেই।

মা উত্তর দিল ঃ ওরে একা কই পাঠাইবা। চলো, আমরাও যাই। থাকন যাইবো না। কখন যে কি হইবো কওন যায় না।

ঃ ঐখানে গিয়া খামু কি ? জমি-জিরাত কইরাই বুড়া হইয়া

গেলাম। না—হিখছি পড়া না হিখছি কোন হাতের কাম। ঐখানে গেলে কি জমি পামু?

ঃ সব চইলা গেল। গেরাম ছারখার হইয়া গেল। তাগো যদি জায়গা হয়। আমাগো হইবো না ক্যান?

ঃ তা হয় না খুকীর মা—তা হয় না। বাপ-ঠাকুরদার ভিটা ছাড়তে পারুম না। কপালে মন্দ থাকলে এইখানেই মরুম। অন্যখানে গিয়া মরতে পারুম না।

ঃ আমারো কি যাইতে ইচ্ছা করে! কিন্তুক, খুকী তো বড় হইবো, তখন কি করবা। দিনে ডাকাইত আইলে কি করবা, তা ভাইব্যা দেখছো।

ঃ হেইর লাইগাই তো কইত্যাছি শান্তিরে পাঠাইয়া দেই। ওর মামার বাসায়। মাসে মাসে কিছু কিছু দিমু।

ঃ তাই ছ্যাও। এইখানে থাকতে ডর করে। চারিদিকে চাইলে চক্ষে জল আসে। সোনার ছ্যাশ কি হইয়া গেল।

ঃ কপালে আরো যে কত দুঃখ আছে কে জানে!

মা, বাবার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম আর বেশিদিন নয়। এই নীলাকাশ। গাঙে—রঙ্গিলা মাঝির ভাটিয়ালী গান। কাশফুলের হিন্দোল। ইলশেগুঁড়ি—ইলিশের নাও। ঝর-ঝর বৃষ্টি। খাল-বিলে থই থই জল। সবকিছু—সবকিছু ফেলে চলে যেতে হবে,—হবেই।

পাসপোর্ট, ভিসা, মাইগ্রেশন, দালাল করার পর ছাড়পত্র পাওয়া গেল। গ্রাম-সম্পর্কে কাকার সংগে পাঠাবার বন্দোবস্ত হল। নতুন দেশে যাওয়ার আনন্দ এলেও পুরোপুরি তা প্রকাশ পেল না। বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন। কুকুর, বিড়াল, গরু, সবকিছু ফেলে চলে যেতে হবে। মাঘ-মণ্ডলব্রত, নৌকায় করে দুর্গা প্রতিমার ভাসান দেখা, রথের মেলায় আম-কাঁঠালের গন্ধ। মনসা পূজায় নৌকাবাইচ পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠেপুলি। সবকিছু ভুলে যেতে হবে।

অবশেষে পায়ে পায়ে বিদায়-সকাল এল।

বর্ষাকাল; কাকভোরেই ঝমা-ঝম বৃষ্টি! খাল, নদী, বিল জলে একাকার। চারিদিকে জল আর জল। উঠোন ছুঁই-ছুঁই জল। বসতবাড়ি দ্বীপের মত ভাসমান।

চোখের জল, বৃষ্টির জল এক হলে নৌকায় উঠলাম। বাবার চোখ ছল-ছল। মা সোচ্চারে কেঁদে উঠল। বাড়িটার অন্দরে-বাহিরে শোকের ছায়া ঘনাল।

গোয়ালঘরে ধবলী জাবরকাটা রেখে মুখ তুলে তাকাল। বাঘা ল্যাজ নেড়েনেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। টুপটাপ বৃষ্টি আবার নামল।

গফুর মিঞা গলুইতে জল দিয়ে বলল: বদর! বদর!

বড়ঘরের কোণে আম-জামগাছগুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে।

হিজলগাছটা বাঁয়ে রেখে নৌকা পুকুরে নামল। ছইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। বুকের ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসতে লাগল।

বাবা, মা নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে এবং ক্রমে ক্রমে প্রিয়জনেরা দূরে সরে যাচ্ছে।

নৌকাটা ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে বাঁক নিল। গফুর মিঞা লগি রেখে ছেঁড়া পাল টাঙিয়ে দিল।

বৃষ্টি আরো জোরে নামল। হাওয়ায় নৌকা তরতরিয়ে উড়ে চললো। এক সময় গ্রাম ঝাপসা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল। নৌকা গাঙে পড়ল।

অশান্ত ঢেউ উঠছে পড়ছে। জলে অজস্র নাগিনীর গর্জন। নৌকা ঢেউয়ের সঙ্গে উঠছে নামছে। দমকা হাওয়া বইছে চারিদিকে অন্ধকার —আবছা অন্ধকার আলো। দূরে-দূরে দু' একটা নাও। জলে অসংখ্য দামামার শব্দ। জলে, হাওয়ায় যুদ্ধের তাণ্ডব নৃত্য।

গফুর মিঞা ছেলেকে চেঁচিয়ে বলল: সাবধানে হাইল ধরিস

বাপ-জান। সামনে বড় দুর্যোগ।

নৌকা দুলছে। সেই দোলায় গ্রামের ছবিটা হারিয়ে গেল। কানে জলের শব্দ। চোখে ঘূর্ণি। কাকা বললেন: হরির নাম ল। মিঞাভাই থাকতে কোন ডর নাই।

তারপর—ছবির পর ছবি। নারায়ণগঞ্জ। স্টিমার ঘাট। কাতারে কাতারে লোকজন চলেছে। সকলেই এক পথের যাত্রী। সেখানে গেলে নাকি সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। স্বাধীনভাবে থাকা যাবে। কোন অভাব-অনটন থাকবে না। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে না। সবকিছুর সমাধান হবে।

পদ্মা নদী। স্টিমার। গোয়ালন্দ। ট্রেন। চেকপোস্ট। দর্শনা, বার্ণপুর। শিয়ালদহ—। আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বপ্নের শহরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ট্রেনটা।……

সেই ছবিটা হারিয়ে গেছে বহুদিন হল। এখনো মনে পড়ে ঘাটে মা, বাবা, মন্নু দাঁড়িয়ে ছিল। মন্নু নিশ্চয়ই বড় হয়ে গেছে। ষোলঘর হাই স্কুলে কিছুদিন গিয়েছিল। টাকার জন্য পড়া হয় নি। বাবা তো আর পূর্বের মত খাটতে পারেন না। উপরন্তু মার শরীর ভাল থাকছে না। চিন্তায় চিন্তায় শুকিয়ে গেছেন। অসুখ লেগেই থাকে। মেয়ের বয়েস হয়ে গেল, বিয়ে দিতে পারছেন না। মামারা যে আশ্রয় দিয়েছেন, স্কুলে-কলেজে পড়িয়েছেন; এই চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। প্রথমদিকে এর কাছে ওর কাছে টাকা পাঠাতে পারতো, এখন তাও যায় না। মাঝে-মধ্যে চিঠিপত্র ব্যতীত যোগাযোগ রাখার আর কোন ব্যবস্থা নেই। মা, বাবার চিঠিতে সংবাদ অনুভব করি সেই ফেলে আসা কৈশোরের মধুর দৃশ্য। সেই সব কথা। সেই গ্রামের ছবিটা। ছবিটা দেখার ইচ্ছা হলেও দেখার আর কোন পথ নেই। সব সৌহার্দ্য, রাস্তা রাজনীতির খেলায় বন্ধ হয়ে গেছে। এই ঐতিহাসিক সত্য সকলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। জোরজবরদস্তি করে চাপিয়ে

দিয়েছে। ইচ্ছে করলেই মনু দিদিকে দেখতে আসতে পারবে না। দিদির চেহারা কেমন হয়েছে! ভাল না খারাপ। হয়তো চিনতেই পারবে না। মনুকেও চিনতে, পারবো না। শুনেছি, ভীষণ পাজী হয়েছে। মা, বাবার কথা শোনে না।

শাসন করবার ইচ্ছা থাকলেও যাওয়ার কোন পথ নেই! কাঁটাতার দিয়ে সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, সীমানা টেনে দিয়েছে। বিরাট একটা প্রাচীর পার হতে গেলেই গুলি চালাবে। না মরলে অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন।

মাঝেমধ্যেই সেই ছবিটা দেখতে ইচ্ছে করে, কথা বলতে মন চায়। মা এখন কি করছে, ভাঙা দেহ নিয়ে কাঁথা সেলাই করছে, না—কাঁথা সেলাই করবে কি করে! মা'র তো চোখে ছানি পড়েছে। ধবলীকে বিক্রি করে দিয়েছে। গোয়ালঘর নেই—সেখানে ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি।

তিল্লকি মারা গেছে। আহা রে! এখনো মিউ-মিউ ডাক কানে বাজে—কি মিষ্টি ডাক। কি সুন্দর নাদুস-নদুস ছিল সাদা বেড়ালটা। বড় প্রিয় ছিল। কি হয়েছিল কে জানে!

বাঘাকে ডাকাতেরা রামদা দিয়ে কেটে ফেলেছে। বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। বাঘা ঘেউ-ঘেউ করে বাধা দিয়েছিল আর তারই পরিণতি মৃত্যু। কি কৃতজ্ঞ ছিল কুকুরটা।

আশ শ্যাওড়ায় গ্রামটা ছেয়ে ফেলেছে। আগাছায় ভরে গেছে খালি বাড়িগুলি। লোকজন নেই। দিন-দুপুরে শিয়াল ডাকে। রাত্রি হলে যম ভর করে। মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে চোখ বুজে থাকে। কুপী টিম-টিম করে জ্বলে—চারিদিকে নিস্তব্ধ ভয়াবহ কান্না।

কোন উৎসব নেই। কোন আনন্দ নেই। খাওয়া-দাওয়া নেই —সব কোথায় যেন চলে গেছে।

এইসব কথা চিঠিতে জেনেছি। আর শুধু কেঁদেছি। বোবা-কান্না বদ্ধ ঘরে ঘুরে ঘুরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস, চোখের জল, বুকের যন্ত্রণা নিয়ে দিন-রাত চক্রাকারে ঘুরছিল।

কলেজ থেকে ফেরার পথে একটা মিছিল দেখছিলাম। বিরাট ছাত্রদের মিছিল। কি যেন সব স্লোগান দিচ্ছিল : আমাদের দাবি—কিসের দাবি ? সীমানা ভেঙে ফেলবার ! না, ওদের দাবি অন্য—ওদের মুখে অন্য ধ্বনি।

মন্টু সম্ভবত ওদের মত বড় হয়েছে। এখানে এলে রাজনীতি করতো। মিছিলে যেত। না—মন্টু আন্দোলন চালাতো কাঁটাতার তুলে দেবার। ধলেশ্বরী-গঙ্গা এক হবার। ভাইয়ে-ভাইয়ে হাতাহাতি, রক্তারক্তি যে করেছে তাকে শাস্তি দেবার। না এসে ভালই করেছে। এখানে এসে কি পেলাম ? মা-বাবা যে আশা নিয়ে পাঠাল তা পূর্ণ হল কই ! তবে, কেন এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা নিয়ে এখানে দিন-রাত শেষ করছি। কেন ? মা, বাবাই বা কেন এই বৃদ্ধ বয়সে জনমানব শূন্য পাতালপুরীতে বাস করছে। সেই ছবিটা তো পাতালপুরীর ছিল না। সেই ছবিটা তো বীভৎস, বিকৃত ছিল না !

আমি সেই ছবিটা ফিরে পেতে চাই। মা-বাবাকে দেখতে চাই। ধলেশ্বরী গাঙে রঙ্গিলা মাঝির ভাটিয়ালি গান শুনতে চাই।

হঠাৎ একটা ডবল-ডেকার ব্রেক কষলো। ঘ্যাঁচ।

স্বপ্নের ভাবনা বাস্তবে রূপ নিল। শহরের মিছিল। বাস-ট্রাম, রিক্সা, ঠেলাওয়ালা পাশাপাশি রেখে চলে। ড্রাইভার দেখলে গফুর মিঞার কথা মনে পড়ে। সেই প্রচণ্ড ঝড়ে গাঙ পাড়ি দিয়েছিল।

এখানে আন্তরিকতার বড় অভাব।

মেপে কথা বলতে, কৃত্রিমভাবে সাজতে, ভিড়ের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। কিউ, র‍্যাশন, ফাংশন। রেডিও হিন্দি সিনেমা, নাটক, সার্কাস নিয়ে দিন যায়। সোনারিল ট্যাবলেটে রাত্রি শেষ। তারপর রয়েছে নেই-নেই রব। আন্দোলন ধর্মঘট, ঘেরাও, দাঙ্গা-

হাঙ্গামা, গুলী, টিয়ার গ্যাস, পুলিশ, জনতা, ইঁট, সোডার বোতল। সংঘর্ষ, নিহত, আহত। বাদ-প্রতিবাদ, অভাব-অনটন, ধনী-দরিদ্রের লড়াই।

নেই শুধু সেই হারিয়ে যাওয়া প্রীতির ছবিটা।

বাড়ি ফিরে বাথরুমে কল খুললে ধলেশ্বরীকে দেখতে পাই। স্নান করতে গিয়ে ডুব-সাঁতার খেলা। গীতা-কানু ওরা সব হেরে যেত। আজকে নিজেই প্রীতি-ভালবাসা, স্নেহ-মমতার কাছে পরাজিত।

চা খেতে বসলে ধবলীর ছবি। মা বালতি ভরে দুধ দোহাতো। ভাত খেতে বসলে ঢেঁকির কথা মনে পড়ে। আহা রে! শীতের সকালে রোদ পিঠে করে বাসি কইমাছের তরকারি দিয়ে কড়কড়া ভাত খাওয়া। কোঁচড়ে মুড়ি ভরতি করে নামতা মুখস্থ করা। না—না—আর ভাববো না।

ঘরে এলে মামিমা বললেন : এত দেরি হল কেন রে?

: যা ভিড়। হেঁটেই এলাম।

: অতখানি রাস্তা!

: হ্যাঁ—দেশে তো কত হেঁটেছি।

: এটা দেশ নয়—শহর। বাড়ি থেকে চিঠি লেখে সাবধানে চলাফেরা করতে—আর তুমি কি না!

: আর কোনদিন হেঁটে আসবো না।

: আজকে চিঠি এসেছে।

: কই, কখন এল?

: দুপুরের ডাকে।

চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলাম। বুকটা দুরু দুরু করছে। হাত-পা অবশ লাগছে। সব ভাল আছে তো? যা দেশের পরিস্থিতি। গণ্ডগোল। দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগেই রয়েছে।

বাবা লিখেছে। অক্ষরগুলি স্পষ্ট নয়—হিজিবিজি। সাবধানে

থেক। সময়মত খাওয়া-দাওয়া করো। ভালই আছি। কোন চিন্তা করো না। চতনার পাড় দিয়ে বড় রাস্তা হয়েছে। ঢাকা অবধি বাস যায়। যাতায়াতে অনেক সুবিধা হয়েছে। তোমার মা সবসময় তোমার কথা বলে। একবার এসে দেখে যাও। তোমাব মা নিয়ে যেতে বলে। তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে। তুমি কত বড় হয়েছ। বাসে কত মানুষ আসে-যায়। তুমি আস না কেন! পথের দিকে চেয়ে থাকি। আর কতদিন থাকবো। তোমার মা চেয়ে থাকতে থাকতে অন্ধ হয়ে গেছেন।···

মা—মাগো!

উঃ কি যন্ত্রণা। বুকের মধ্যে ইস্পাত ফলার যন্ত্রণা। চোখে কাঁটাতারের দেওয়াল। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। শরীর কাঁপছে। দাঁড়াতে পারছি না। হাত-পা ভেঙে পড়ছে। জানালায় দেহটা ছেড়ে দিলাম।

বলি, আকাশ—মুক্ত পাখি করে দাও—মাকে দেখতে যাব। গংগা পদ্মার পারে যাবো। সীমানার প্রাচীর বন্যায় ভাসিয়ে দাও। মাকে দেখার এখনো সময় আছে।

মা—মাগো······

আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না। কাঁটাতারের দংশনে দংশনে সেই প্রীতির ছবিটা শেষ হয়ে গেল। পরবর্তী বংশধরেরা প্রশ্ন করলে কি উত্তর দেব?

● পরিচিত-অপরিচিত

দীপার সাথে গোলমাল বাধার পর থেকে কিছুই ভাল লাগে না। বস্তুত আমার কি করা উচিৎ, কি করলে ভাল লাগবে, কিছুই বোঝাতে পারি না, নিজেও বুঝতে পারি না। বন্ধুরা বলেন, চঞ্চল হলে কোন কিছুই ভাল লাগে না। কোন একটা বিষয় নিয়ে লেগে থাকতে হবে। অস্থির চিত্ত হলে কেউ কোনদিন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। সব কথাই মানি কিন্তু ব্যাপারটা বড় জটিল। মানুষের ভাল লাগা মন্দ লাগা তর্কাতীত নয়। সকাল বেলায় রাস্তায় কুয়াশা থাকলে মনে হয় বাড়ীঘর না থেকে যদি গোলাপ ফুলের বাগান হত। তাহলে নিশ্চয়ই ফুলের পাপড়ি সবুজপাতা, শিশিরে টলমল করতো। ইচ্ছে করলে বাড়ীঘর ভেঙে ফুলের বাগান খুব সহজেই করা যায়। এই সব এলোমেলো ইচ্ছা সম্পর্কে বন্ধুরা বলেন, তোর মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে। লুম্বিনী পার্কে দেখান দরকার। সেই তো কথা ! অন্যরা না ভাবলেও আমার মাথায় এই সব ব্যাপারগুলো ঘোরপাক খাচ্ছে।

শহর ভেঙে গ্রামের কায়দায় ঘর-বাড়ী তৈরীর একটা নকসা পরক্ষণেই করে ফেলি কিন্তু তাও বেশিক্ষণ নয়।

রাস্তায় নামলে মানুষের পোষাকের অন্তরালে স্বাভাবিকভাবেই চোখ যায়। কখনো কখনো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখি। এক এক সময় ভাল লাগে। সময় সময় মনটা বিরক্তিতে রি-রি করে। আবার ভাবি রঙ বাহারি পোষাকের প্রয়োজন নেই। সকলের মধ্যেই তো রক্তমাংসের ডেলা। তা ঢাকবার জন্য কোন একটা কিছু হলেই হল। অত বাহারের কি দরকার। কিংবা সকলেরই রঙ সাদা হলে খারাপ হত কি ? কিংবা লাল। ঝকঝকে পোষাকে মনে হয় বাইরেও আছে ভিতরেও আছে। আসলে কোন কিছুর মধ্যেই পুরোপুরিভাবে নেই। সবটাতেই লুকোচুরি

খেলা। কাপড় না পরলে নগ্নতাবাদ বিষয়ে অনেক কথা উঠবে। ওসবের মধ্যেও যাবো না। মাঝে মধ্যে ভাবি মন্দ হয় না। আকর্ষণ বিকর্ষণের খেলার রূপটা কোন্ খাদে যায় দেখা যেত। আসলে আমার কোন কিছুই ভাল লাগে না। নিয়মমাফিক কাজকর্ম, লেখাপড়া, চাকরি-বাকরি, প্রেম, বিয়ে-থা, ছেলেপেলে, ঘর সংসার, হাটবাজার ইত্যাদি। একই ঘটনার পূর্বানুবৃত্তি। কেমন যেন বিশ্রী একটা অবসাদ। সারাক্ষণ এই সব চিন্তা ভাবনাগুলি আমাকে ভীষণ-ভাবে যন্ত্রণা দেয়। কোন কিছুই মনে প্রাণে মেনে নিতে পারি না। অথচ কিছুই ফেলতেও পারি না। আবছা আবছা ভাবে সব কিছুতেই জড়িয়ে আছি। সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না—অথচ উঠতে হয়, হাত পা মুখ ধুতে হয়। চা খেতে খেতে মার কথা মনে পড়ে। বাজারে যেতে আমার ভীষণ অনিচ্ছা। অত লোকের ভীড়ে বেচাকেনা চলছে। যাচাই বাছাই জিনিষগুলো থলেতে ভরছে। ওসব আমার ভাল লাগে না, অথচ যেতেই হয়। কোন দিন না করলে মা বলেন, খাবার সময় বেশ তো চলে ওটা দাও, এটা দাও। একটু এদিক ওদিক হলে কত কথা। বাজারে না গেলে খাওয়া হবে কি করে? পেটে তো দিতে হবে। বাবা ভোরবেলায় টিউশনিতে যান। আর বাড়ী ফেরেন না। ওখান থেকেই আপিসে যান। মানে—সংসার চালাতে গিয়ে সামাজিক পার্বণগুলি ভুলে গিয়ে কেবলই দৌড়োচ্ছেন।

যেটুকু বাসায় থাকেন মার সংগে খ্যাচখ্যাচ করতেই চলে যায়। কোন দিন মা-বাবাকে এক সংগে হাসতে দেখিনি। আমি বাড়ীর বড় ছেলে। পড়াশোনার পাঠ চুকে গেলেও হাতে কোন কাজ নেই। কোন দিন কাজ করব কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। কাজের মধ্যে সকাল বেলায় বাজারে যেতে হয়। সপ্তাহে নিজের কাপড়-চোপড় ধুতে হয়। বাদবাকী সময় এপাড়া ওপাড়া আড্ডা দিয়েই কেটে যায়। মাঝে মধ্যে দু একটা সিনেমা। যেন টাইপ-রাইটার মেশিন। সব কিছু লেখা আছে। টিপলেই হল। তা ছাপা ছাপা হয়ে যাবে। সেদিন

বাজারে গিয়ে ডিমওয়ালী এক বুড়ীকে জিগ্যেস করেছিলাম—"ডিম ভাল ?" উত্তরে বলেছিল—"কি কন বাবু, ঘরের ডিম।" এমন ভাবে বলল যেন কিছুই জানে না। সত্য কথা বলছে। অথচ চোখেমুখে ছলনার ছাপ। শহরের মানুষেরা ভাবে এদের কাছে ভাল জিনিষ থাকে—একদম তরতাজা। আমি একদিন দেখেছি বাজারের ঘরে চালানি ডিমের ঝুড়ি থেকে চার পাঁচটা ডিম এনে তাতে ছিটে ফোঁটা মাটি লাগিয়ে কলাপাতায় রাখল।

মনে হবে গাঁয়ের ডিম। ওদের এ চতুরালি সহরের বাবুরা ধরতে পারেন না। ব্যাপারটা মন্দ নয়। কেউ না কেউ ঠকছে। সে একজনকে ঠকাচ্ছে। আর একদিন আর একজনের কাছে সে নিজে ঠকছে অথচ মজার ব্যাপার কেউ বুঝতে পারছে না।

দীপেশের কাছে বলছি—"তোমার স্ত্রীর মত চরিত্রবতী হয় না। চোখ তুলে কথা বলে না। তোমার ভাগ্য বটে।" অথচ দীপেশ অফিসে গেলে ফ্ল্যাটে গিয়ে সুপর্ণাকে ডাকি। চরিত্রবতী বৌ শরীর হেলিয়ে দুলিয়ে আলু-থালু বেশে কোন রকমে দরজা খুলেই বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। মানে ওসব ব্যাপারের মধ্যে কোন লজ্জা নেই। বলি—"দীপেশের মত মানুষ হয় না। আমার প্রিয় বন্ধু। ওর মত চরিত্রবান পুরুষ আজকাল আর দেখা যায় না।" সুপর্ণা কোন কথার উত্তর দেয় না। চোখে চোখ রেখে হাসে—কি যেন বলতে চায়। এই যে দু'রকম চরিত্রে আমরা সকলেই কমবেশী অভিনয় করছি। কেউ সার্থক, কেউ ব্যর্থ। আর যারা একেবারেই পারছেন না। অশান্তি, জ্বালা, যন্ত্রণা নিয়ে দুঃস্বপ্নের মত সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন।

এখন ভাবি সেই সময় দীপাকে সত্যি কথা না বললেই ভাল হত। বিয়ে করতে পারবো না। এ কথা কোন মেয়ের মুখের ওপর বললে সে কি কিছু দেয়? কিছু পেতে হলে বলতেই হয় তোমাকে বিয়ে করবো। তুমি কি সুন্দরী! আহা! তুলনা হয় না। এর মধ্যে ভালবাসা, ভাল লাগার কোন ব্যাপারই নেই। কোন রকমে আবোল

তাবোল বলে কিছু আদায় করে নিলেই হল। অথচ দীপাকে মিথ্যা কথা বলতে পারিনি।

আমি পারি না—এই সব মানিয়ে চলতে। বন্ধুরা বলে মন আর মনন দু'টো আলাদা জিনিষ। বাইবে এক, ভিতরে আব এক। এই দুটো কথাই সমান। সমানভাবে চলতে পারে না, তা কেন হবে? আমি যা তাই থাকবো। চলনে বলনে একটা পথই বেছে নেব। অন্দব বাহির ব্যাপারটা কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। আমি বললাম মাংস খাই না। বস্তুত মুরগীর মাংস কেউ খেতে দিলে আস্ত মুরগীটা চোখেব সামনে দেখি। পাঁঠার মাংস খেলে পেটেব মধ্যে ভ্যা ভ্যা ডাকে। তখন—তখন আমি আমার মধ্যে থাকি না। চোখের সামনে অসংখ্য মুবগী দেখি। অসংখ্য পাঁঠা দেখি। সমস্ত কিছু অবিশ্বাস্য—অবিশ্বাস্য মনে হয়।

দীপা মাংস খেতে ভালবাসে, নিটোল মাংসের টুকরো দিয়ে তৈবী শিক কাবাব। আচ্ছা! খাসা! খেলে নাকি অনবরত টসটস কবে জিভে জল আসে। অথচ আমাব কাছে কিছুই মনে হয় না। দীপাব বেলায় ও তাই মনে হয়েছিল।

বাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, ভেঙে সমুদ্র বানালে কেমন হয। চারিদিকে—থৈ—থৈ জল।

মানুষ—মেয়েমানুষেরা জলেব মধ্যে হাবু-ডুবু-খাচ্ছে। কেউ পাড়ের নাগাল পাচ্ছে না। দীপা জলের মধ্যে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে—দেখতে পাচ্ছি অথচ কিছুই করার নেই।

তক্ষুণি—মনে পড়ল—মা কিছুমিছু নিয়ে যেতে বলেছে—না নিয়ে গেলে কপালে ভাত জুটবে না। এটা আন। ওটা আন। লেগেই রয়েছে। আসলে মার চাওয়ার শেষ নেই। বাজারের সবকিছু এনে দিলেও মা সন্তুষ্ট হবেন না।

দোকানে গিয়ে কিছুমিছু পেলুম না। অনেকগুলি মণিহারি দোকান দেখা গেল। ওরা শুনে অবাক বিস্ময় তাকায়—যেন কোন জন্মে

শোনেনি। মা—নিশ্চয়ই কি বলতে কি বলেছে—রাতদিন সংসারের ঝামেলায় মাথা ঠিক নেই। থাকার কথাও নয়। আমারও ভুল হতে পারে। যা হোক আজ কপালে ভাত নেই। যাক্‌গে আমি তো আর বেশী দিন বাঁচবো না অত শত ভেবে কি দরকার। বই পত্তর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখব। ঘুমোবার ভান করে স্রেফ চৌকিতে সটান শুয়ে থাকবো। ততক্ষণে কিছুমিছু আবিষ্কার না হলেও রান্না শেষ হবে।

মা—আজকাল অন্যচোখে দেখছেন। সোজাসুজি ভাবে কথা বলছেন না। আসলে মা কি যেন পেতে চান—ইচ্ছা পুরণ হচ্ছে না বলে দুঃখের অন্ত নেই। মার কিছুমিছু জোগাড় করবার জন্য—পাহাড়, নদী-নালা, মরুভূমি পেরিয়ে অনেক দূরে চলে যাব—কিছুমিছু না নিয়ে আর ঘরে ফিরবো না।

মাধুরীকে কথা দিয়েছিলাম, সুখের ঘর কিনে দেব। কেননা ও আমাকে বাজার থেকে এনে দিতে বলেছিল। তিন-ভুবনের হাট-বাজার তন্ন-তন্ন খুঁজেও সুখের ঘর পাইনি।

দীপা, সুপর্ণা, মাধুরী সব ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। অথচ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে কারোর বিন্দুমাত্র ফারাক নেই, সবই এক।

দীপাকে মিষ্টি করে গালভরা কথা বললেই—পাওয়া যেত। অথচ বলি-বলি করে বলা হয়নি।

সুপর্ণা সবকিছু দিয়েছে অথচ কি যেন কি যেন পাওয়া হয়নি। মাধুরী নির্ভর করতে চেয়েছিল অথচ নেব নেব করে নেওয়া হয়নি।

কফি-হাউসে উত্তেজনা নেই। ওখানে আর কোন রহস্যই নেই। সবকিছু—অথর্ব অন্ধকার।

দীপার বুকে মাধুরীর বুক অপারেশন করে বসাতে হয়। সুপর্ণার মনের সঙ্গে দীপা অথবা মাধুরীর পাল্টালে হয়। নইলে—কিছুমিছু, সুখের ঘর খোঁজে—ভাসুক আমার স্মৃতি—ভাসুক আমার ভেলা।

● সুখের বনে উলানিপোকার বাসা

চকের ধানকাটা শেষ। নাবাল জমিতে আমন ধান কাটা হয়নি। অঘ্রাণের শেয়াশেষি তাও কাটা হয়ে যাবে। বড় পুকুরের পাড় জেগে গেছে। কচুরিপানা ও কলমির দাম পাড়েই আটকে গেছে তা আর নামতে পারেনি। এই সময় চক থেকে সব মাছ পুকুরে নামবে। বস্তুত হরনাথ এই সময় কিছু পয়সা রোজগার করে। এবারও জিলা দেবার জন্য ছিপ বড়শি ঠিকঠিক করে রাখল। অবিশ্যি সে জেলে নয়। তার শখ। এখন পেশায় দাঁড়িয়ে গেছে প্রায়।

হরনাথ আকাশে চিল দেখতে পেয়ে খুশীতে নেচে উঠল। এই তো মাছ ধরার সময়! অবশ্য হরনাথের কাছে সব ঋতুই সমান। এমন মাছ নেই যে সে ধরতে পারে না। মাছের পোকা! কোন পুকুরে কি মাছ আছে কোন বিলে নেই সব নখদর্পণে। ধরার ব্যাপারটাও বর্ষায় একরকম, শীতকালে অন্যরকম।

হরনাথ ভাবে, এবার বেশ কিছু মাছ ধরতে পারলে বৌকে বাবুর হাটের কাপড় কিনে দিতে পারবে। অথচ বৌ তাতে সন্তুষ্ট নয়। উল্টো গালাগালি করে। তবু আজ রাতে গিয়ে দেখবে পাওয়া যায় কিনা কিছু। বৌটার জন্যই হয়েছে মুস্কিল। রাতে কোথাও থাকতে দিতে চায় না। মাছের সংগে হিংসা। কেননা ওদের জন্যেই তো রোজ রাতে খালে বিলে কাটায়। এই জন্যে বৌ'র সংগে খিটমিট লেগেই রয়েছে। আর এই ব্যাপারটার জন্যই দু'জনে যেন অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। একজন আছে মাছ নিয়ে আর একজন সংসার নিয়ে। এমন দিন নেই যে ঝগড়া লাগে না।

রাইতের সময় খালে বেশ মাছের ওয়াশ শোনা যায়। ধরলেও ধরতে পারে। যদিও গেল সনে কিছুই ধরতে পারেনি। সেবার অবিশ্যি

আশা করেছিল পূবের-ভিটায় ঘর তুলবে কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। আসলে হরনাথ যা আশা করে তা হয় না। ইচ্ছা ছিল বাবুদের মত ঘর সাজাবে। তুলসীতলায় দোপাটির গাছ লাগাবে। কিন্তু ওর ইচ্ছাটা কার স্পর্শে যেন, লজ্জাবতী লতার মত গুটিয়ে যায়।

অপরাহ্ন বেলা। ভাতশালিখ চড়ুই দুয়ারে নেমেছে। উত্তর পাড়ায় কোন বাড়ীতে বোধহয় চিড়া কুটছে, তারই শব্দ শোনা যাচ্ছে। বুচি, কানন কানামাছি খেলছে।

এবার বর্ষায় জল অনেক উপরে উঠেছিল। ঘাটের কাছে নিমগাছটায় তার দাগ এখনো রয়েছে।

বৌ দুয়ারে ঝাট দিতে-দিতে বললেঃ দোহানে কখন যাইবা? কিরাসিন তেল নাই। আন্দারে কিন্তুক থাওন লাগবো।

হরনাথ বৌ'র দিকে একবার তাকালো। বিকালের শেষ রোদ ওর মুখে শরীরে নেমেছে। কি বলছে সে কথা শুনতে পায়নি—বলল ঃ হুক্কাটা দ্যাও।

ঃ অঃ মরণ! পা-রাহনের সময় নাই তা-মা-ক খাও-য়াও! রসের লাগর। কইলাম যে তেল নাই?

হরনাথ চমকে উঠল পুটলি বলছে তেল নাই। যে নাকি রাতে কোথাও যেতে দিতে চায় না—সে কি না বলছে—তেল আনতে। হরনাথের মনে হল—ক্ষ্যাপাচ্ছে। বস্তুত তেল না থাকলেই মাছ ধরতে যাওয়া সম্ভব নয়। এই জেনেও বলছে, হরনাথের যেন বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস করতে পারে না। তাহলে—হয়তো সত্যিই নেই।

হরনাথের দোকানে যেতে ইচ্ছে করে না। আসলে রামহরির কাছে ক্রমশ বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। কোন বছরই ওর টাকা শোধ করতে পারে না। ব্যাটা! সাক্ষাৎ বোয়াল মাছ। আস্তে আস্তে চৌ-চাল্লা ঘর তুলছে। এধারে ওধারে শোনা যাচ্ছে দালান তুলবে—হতেও পারে।

এই তল্লাটে আর মুদি দোকান নেই। রামহরি নগদ পয়সা নেয় না।

চাল, ডাল যা দরকার নিয়ে যাও বদলে লাল খাতায় নামটা লিখে রাখলে। এইভাবে চললো—বারোমাস। বছর শেষে দেখা গেল দেনা শোধ করতে জমি বন্ধক দিতে হয়েছে। আর না দিয়ে যাবে কোথায়। গেরামের লোক ওর কথায় ওঠে বসে। কেননা রামহরিই গেরামের মাতব্বর। চেহারাটাও যমদূতের মত। কাছিমের মত গায়ের রঙ। গালে ছাগল দাড়ি। মাসে-ছমাসে কাটে। মাথায় চুল নেই। বিরাট ভুঁড়ি। যখন হাঁটে মেদিনী কাঁপে। হরনাথ কেন যেন লোকটাকে দেখতে পারে না। গা জ্বালা করে। অথচ ওর কাছেই পেটের জন্য যেতে হয়। ঘর তুলবে তার জন্য যেতে হয়! শালা—ডাইন!

বৌ শলা ফেলে কখন যে হুঁকা আনতে চলে গেছে সে খেয়াল নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যি রোদ নেই। আতালে গরুগুলি ছটফট করছে। হরনাথ কিছু কাটা টাগইর দিলে কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়ে গেল।—বুঝিবা কোনদিন ঘাস খায়নি।

বৌ কল্কিতে ফুঁ দিতে দিতে হুঁকাটা বাড়িয়ে বলল—নাও। হরনাথ যেন কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বৌ আর দাঁড়াল না। হন-হন করে চলে গেল। অবিশ্যি তাকে সন্ধ্যা লাগতে না-লাগতে অনেক কাজ করতে হবে। নিজের মনেই গজগজ করে গুষ্টির শ্রাদ্ধ করলে। রাবণের গুষ্টি। ড্যামনা মরে না ক্যান ইত্যাদি-ইত্যাদি।

হরনাথ সেদিকে কান না দিয়ে গর-গর করে হুঁকায় টান দিল। দূরে বিরাট চক। শেষ প্রান্তে সূর্যটা আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। গায়ে বেশ গরম হাওয়া লাগছে। পুকুরের জলে ঢেউ চিক চিক করছে। হরনাথ এক দৃষ্টিতে জল দেখছে যেন মাছ দেখতে পেল।—ওর মনে হল আজ রাতেই বোয়াল, শোল গজার পুকুরে নামবে। সুতরাং রামহরির দোকানে যেতেই হবে। হারিক্যানে তেল না থাকলে রাত জাগবে কি করে। এইবারেই শেষ। যে করেই হোক শালার টাকা শোধ করে দেবে। আর খাতায় নাম লেখাবে না। ব্যাটা চশমখোর।

জিনিষ নিতে গেলেই বলবে—আমি থাকতে ভাইবো না। তোমরা কি আমার টাকা মারবা ? পর-পর ভাবো ক্যান্ !

কথাগুলি চিবিয়ে চিবিয়ে ছুঁড়ে দেয়—দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। ছ'চোখের বিষ। মুখেই মিষ্টি ভিতরে ব্যাটা গরল। পরানের জমি খেয়েছে। বেণীমাধবের বাড়ী নিয়েছে। এক নম্বরের পাজী, শয়তান। নাঃ—এর একটা বিহিত করতে হবে। এইভাবে বেশীদিন চললে কারোরই জমি থাকবে না। বাড়ী থাকবে না।

শেষ অবধি বৌ-ঝিও থাকবে না। বলা যায় না। ব্যাটার মতিগতি ভাল নয়। বাজপাখীর মত চোখ। তাকালে মনে হয় গিলে ফেলবে।

হরনাথের বুকটা কেঁপে উঠল। বৌ'র দিকে তাকাল। মাজা ভেঙ্গে উপুড় হয়ে ছুয়ার ঝাঁট দিচ্ছে। সমস্ত শরীর যেন হেলে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। এখনো গা-গতরে যৈবন ঝকমক করছে। আর একবার বিয়া দেয়ন যায় !

হরনাথ মাঝে মধ্যে অতীতে ফিরে যায়—কেননা সুখস্মৃতি তাকে প্রেরণা দেয়। ভাবতে ভাল লাগে। বস্তুত পুটলির এই খ্যাচ্-খ্যাচ্ আর সহ্য করা যায় না।—কি ছিল, দিনে-দিনে কি হল ? এর জন্য কে দায়ী ? কার জন্য প্রশ্নটা বুকের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায়।

সেবার ভীষণ জল হয়েছিল। চারিদিকে জল আর জল। বৃষ্টি, আর বৃষ্টি ! অবিরাম ঝরছে। সেই দুর্যোগের সময় পুটলির সঙ্গে বিয়ে হল। বাড়ীতে আসার সময় ধলেশ্বরী নদীতে প্রচণ্ড তুফান। সে কি তাণ্ডব ! নৌকা ডুবে গেল। ঝুপ-ঝাপ সকলেই নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ল। বরাত জোর—মাঝি-মাল্লারা ঝড়ের মধ্যেও পাড়ের কাছে গিয়েছিল। সেইজন্যেই মাটিতে পা-রাখতে পেরেছিল। নদীতে সে-কি ঢেউ। আর বৃষ্টির ছাঁট। প্রলয়। মনে হচ্ছে ধানজমি, গেরাম সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

পুটলিও বসেছিল না। জল ছেঁচতে লাগল। নৌকার গলুই

পাছা কিছু বোঝা যায় না। লগি মেরেও রাখতে পারছে না। পাটাতন ভেসে যে কোথায় গেল, কে জানে। বৃষ্টির ফোঁটায় গম-গম শব্দ। বাতাসে সোঁ-সোঁ আওয়াজ। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! এখনো মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে। কত বছরের কথা অথচ মনে হয় এই সেদিন।

হরনাথ তখনি ভেবেছিল পুটলি যুঝতে পারবে। বরযাত্রীরা সকলেই প্রশংসা করেছিল। বলেছিল—সাহস আছে। হরনাথের কপাল ভাল। বৌ'র গুণও আছে, রূপও আছে। শুনে আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু মনের মধ্যে একটা দুঃখ, ঘরে ছেলে নেই। দুটোই মেয়ে। ওঝা দেখিয়েছে। মাদুলি দিয়েছে যাতে ছেলে হয়। বুড়াবুড়ি গাছতলায় পাঁঠা মানত করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। মনে হয় আর হবে না। এইজন্যই ঘরে অশান্তি। সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমুল কাইজা লেগে যায়। আসলে পুটলি হরনাথকে সহ্য করতে পারে না।

পুটলি শাসায় মুরোদ নেই। হরনাথ উল্টে ওকে সন্দেহ করে। ইদানিং ঐ জানোয়ারটা ক্রমাগত বাড়ীতে আসা যাওয়া করছে। অবিশ্যি তেমন কিছু চোখে পড়েনি। পুটলি সেরকম নয়। ওর প্রতি বিশ্বাস আছে। যদিও মেয়েমানুষের মন বলা যায় না। কখন কার প্রতি ঢলে কে জানে! এই বৃষ্টি, এই রোদের মতন।

দুয়ার থেকে পুটলি চেঁচাল—যমে নিল নাকি! বলি, গেলা না। হরনাথ যেন স্বপ্নময় জগৎ থেকে ফিরে এল। পুটলির খোলা বুকে চোখ রাখল যেন চিতলের পেট।

হলুদ পাখিটা তখন থেকে ডাকছে। ঘরে আয়—ঘরে আয়। বস্তুত দিনের শেষ। ডাহুক ঝোপে ঢুকে ঝট-পটানি আরম্ভ করেছে। তুলসীতলায় সন্ধ্যামালতীর গাছে ফুলগুলি ফুটি-ফুটি করছে। দুয়ারে চড়ুই-এর জটলা। বিড়ালটা চৌকাটে বসে—ওৎ পেতে বসে রয়েছে কখন যে লাফ মারবে তার ঠিক নেই। আর দাঁড়াল না—একটা

ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিল। হুঁকাটা রেখে গরুগুলি ছেড়ে দিল।

হরনাথ মুখ দিয়ে অদ্ভুতভাবে আওয়াজ করল—র-র। মানে ওদের বেপরোয়া ভাবকে সংযত করতে চাইল। দুধেল গাই। এই মাসেই বিয়োবে। একটু এদিক ওদিক হলে রক্ষে নেই।—ধবলির গলায় সে হাত দিলে, ওলানে হাত দিলে। দুধে টইটম্বুর। রামহরিরও খুউব লোভ ধবলিকে কিনে নেয়। অনেকবার টাকা সেধেছে—কিন্তু হরনাথ নিতে চায়নি উল্টো কথা শুনিয়ে দিয়েছেঃ মহাজনের পো, চাল দাও, ডাল দাও, তার বদলে টাকা নিবা। কিন্তুক এইড্যা কি কথা কও। খবরদার আর কোনদিন ও নাম মনে আনবা না। কইয়া দিলাম। মহাজন ভাবল নেশায় খালেবিলে ঘুরলে কি হবে আসলে সবদিকেই নজর আছে। বলেছিল না-না—তোমার সাধের জিনিষ নিমু ক্যান।—কথার কথা কইলাম। কিনুম না। দুই-একদিন দুধ দিলেই হইবো। হরনাথ নিজের মনেই বললে···আর না। তোমারে অনেক খাওয়াইছি। যেদিনে যে মাছ, ভালোটাই নিয়া গেছ। তাও পেট ভরে না, ব্যাটা রাক্ষস! হেদিন কী কও কাননের মার হাতে মাছের তরকারী গেরামের সেরা। যা-খাওনের খাইয়া লইছো—আর না।

হরনাথ যেন আবার বাড়ীর দিকে তাকাল। পুটলিকে দেখা যায় কি না—কাছেপিঠে কোথাও দেখতে পেল না। পুটলির বুকেও হরনাথ হাত দেয় কিন্তু সে সুখ পায় না। বরং বিরক্তিকর। এখন আর আগেকার মত শরীর নেই। থাকবেই বা কি করে—দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটে না। শরীর থাকবে কি করে! উপরন্তু পিশাচের চোখ পড়েছে। এখন থেকে আবার একবেলা খেতে হবে। কেননা গেল সন ভাল ধান পায়নি।

নতুন ধান ঘরে না আসা অবধি এইভাবেই চালাতে হবে। কিন্তু ততদিন বাঁচলে হয়। অবিশ্যি সেজন্য ভাবে না—বছর শেষে টান পড়ে তা তো জানা কথা।

হরনাথের হাত থেকে মাছেরা পালিয়ে যেতে পারে না। অথচ পুটলিকে ধরতে পারে না—পালিয়ে যায়। ওকে ঘরে রাখতে জবর কষ্ট। বলেঃ তুমি, আমার কাছে আইসো না। গায় আঁইশটা মাছের গন্ধ। ওয়াক্ থুঃ বমি আইসে। পুটলির মুখ চোখ ঘৃণায় কুঁচকে যায়। একদিন নয়, দু'দিন নয়। দিনের পর দিন এইভাবে হরনাথকে ঠেকিয়ে রেখেছে। মেয়ে দু'টো হবার পরেই যেন ওর এই বিদ্বেষ! সন্দেহটা আরো বেড়েছে এই কারণে।

হরনাথ যে বোঝে না তা নয়। কিন্তু রাত হলেই যেন মাছেরা ডাকে—নিশি পায়। কতদিন ভেবেছে—ঘরে একলা বৌকে রেখে মাছ ধরতে যাবে না। তখন আর জ্ঞান থাকে না—পাগল হয়ে যায়। কখন যে খালে নামবে—তারই প্রহর গোণে। পুটলিও টের পায় না। মরার মত ঘুমিয়ে থাকে। কাক ডাকলে বুঝতে পারে তক্ষুনি—সেই বিরোধটা দানা বাঁধে। তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা অত গোলমেলে নয়। পুটলি চায়—হরনাথ মাছ-ধরা ছেড়ে দিক। তাহলে আর রাতে মাছের জন্য বাইরে থাকবে না। এই জন্য মাছের প্রতি ওর রাগ। নির্বংইশ্যা ড্যাকরাদের জন্যই তো—এই হাল হয়েছে। হরনাথকে সরিয়ে নিয়েছে।

বর্ষাকালেই নয়—সব সময়। মাছ ধরবার যন্ত্রপাতিও কম নেই। টেঁটা, পলো, ওচা, চাই, ইলিশের জাল খড়াজাল, বড়শি—কত কি! নামও ছাই মনে থাকে না। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে একটু এদিক ওদিক হলে রক্ষা নেই। অথচ ঘরের দিকে মন নেই। কি আছে না-আছে কোন খবর রাখে না। সংসার সম্বন্ধে ভীষণ উদাসীন। মেয়েরা কি খেল না খেল সেদিকেও খেয়াল নেই। আজব মানুষ। শুধু মাছ আর মাছ। গেরাম শুদ্ধ্ বিলাও। কি হয় তাতে ওদিকে রামহরির খাতায় টাকার অঙ্ক বাড়ছে। অবশেষে পুটলি বলেছে মাছ বিক্রী করতে, যা হোক কিছু পয়সা আসুক। মাছ খেলে তো পেট ভরবে না।

হরনাথ যেন ধবলিকে আদর দিয়ে আদর পেতে চায়। বড় বড় চোখ করে আরো এগিয়ে আসে। মনে হয় কত আপন। অনাবিল আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে যায়।

মানুষের সখ বলতে, সুখ বলতে একটা বস্তু আছে।—পুটলি তা বোঝে না। ওর মুখে নেই-নেই রব। আজকে চাল নেই, কাল লবন নেই। যাও রামহরির দোকানে হরনাথ সেইজন্যেই সন্দেহ করে। আগে কিন্তু এরকমভাবে চেঁচাত না। একটা জিনিষ না থাকলেও মানিয়ে নিত। দোকানে যেতে চাইলে উল্টো মানা করতো। রামহরিটা রাতে বিরাতে আসে নাকি? কওন যায় না।

পুটলি শুধু খ্যাচখ্যাচ করে, একটা ঘরে ধরে না। খাট নেই। বালিশ নেই। ছেঁড়া কাঁথায় বলে ঘুম আসে না। আসলে ও সুখ চায়। বিলাস চায়। হরনাথ তা বোঝে না—অন্যরকম ভাবে।

ভিতরের অথবা বাহিরের গোলমেলে ব্যাপারটা এইখানেই। কিন্তু দু'জনেই রুখে দাঁড়ায়। প্রকাশ করে না। সেইজন্য আশে-পাশের লোকজন কিছুই জানতে পারে না। একটা উলানি পোকা শুধু দু'জনের বুকের মধ্যে কামড়ায়। অথচ সেই পোকাটাকে সাহস করে মারতে পারে না।

হরনাথের কি ইচ্ছা হয় না, বাড়ীতে দালান উঠুক, গোয়ালে গরু থাকুক, ঘাটে বাইরের নৌকা থাক। ধলেশ্বরী নদীতে বাইচ খেলতে ওর খুব ইচ্ছা। কিন্তু পরের নৌকায় যেতে চায় না। পদ্মা নদীতে একবার ইলিশ মাছ ধরতে গিয়েছিল—তখন দেখেছে বাইচ কারে কয়। ইয়া পিল্লাই নাও! গাঙের জলে যেন তুফান ওঠে। শীতলক্ষা নদীতে ডাইন মাছ ধরতে গিয়ে বাইচ দেখেছিল।—কিন্তু মানুষের ইচ্ছা কি সব সময় পূরণ হয়—হয় না।

হরনাথ ঘাটে এসে নৌকার দড়ি খুলে নৌকায় উঠল। নৌকাটা টাল খেয়ে জলে ঢেউ খেলে গেল। পাড়ের মাটিতে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হল। বুঝিবা পাড় ভেঙ্গে পড়ল। পুটলি চেঁচাল: বতাল নিছ?

ঃ দিয়া যাও।

তখন সূর্যটা লাল থালার মত হয়ে দেবদারু গাছের পাশ দিয়ে আস্তে-আস্তে ডুবে যাচ্ছে। জলের মধ্যে সোনালি আলো চিকচিক করে ঢেউ খেলে—খেলে বেড়ায়। পাখিরা মাঠ থেকে বাসায় ফিরছে। কাঠ-মালতীর ডালে দোয়েল ডাকছেঃ টুই—টুই। পুকুরের মাঝখানে বিরাট একটা ঘাই দিল। নিশ্চয়ই বড় মাছ। একবার এই রকম ওয়াশ দেখে জলে ডুব দিয়েছিল চিতল মাছের ডিম আনবার জন্য। এনেছিল কিন্তু মাছ ধরতে পারেনি। টেটা লাগিয়েছিল রাখতে পারেনি—ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। দু'দিন পর খালের পাড়ে ভেসে উঠেছিল। এইজন্য লোকে বলে হরনাথ মাছের পোকা। খালি হাতে জিওল মাছ ধরে। অথচ কাঁটা দেয় না। একবার শুধ্ বোয়াল মাছে কাবু করেছিল। চকে জল নেমেছে। সেই সঙ্গে বোয়াল মাছ। নতুন জলে ডিম পাড়ার এইতো সময়। পলো দিয়ে চেপেছিল। কিন্তু রাখতে পারেনি। উল্টে ফেলে দিয়েছিল। বাপের ব্যাটা হরনাথ সেই বোয়ালটাকে সকালবেলায় ধরেছিল। তার জন্যে সারারাত সমস্ত বিল খুঁজতে হয়েছে।

বিলের জল পাক খেয়ে খেয়ে খাল দিয়ে পুকুরে নামছে। এখনই জিলা দেওয়ার সময়। খালের কিনারে কিনারে বড়শিতে তিতপুঁটি কিংবা বইচ্যা গেঁথে কিছুটা জলে কিছুটা জলের ওপরে রাখলে মাছটা নড়বে আর সেই দিকে গজার শোল ঢুম করে সেটাকে গিলবে আর তক্ষুণি বড়শিতে আটকে যাবে। উলুর মতন। হারিক্যানের আলো দেখে পাখা মেলে দেয়, কিন্তু সেই আলোর কাছে পৌছাতে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। এখানেও সেই অবস্থা। কত সাধ। অথচ জানে না লুকোচুরির খেলায় কেউ জিততে পারে না।

ঃ এই লও।

হরনাথ থতমত খেয়ে গেল। বৌ পাশে দাঁড়িয়ে শিশি বাড়িয়ে দিল। সে বৈঠা হাতে নিল। জলে ফেলল। ইচ্ছা হল পুটলিকে

নিয়ে গাঙে যায়। বেশ চওড়া গাঙ। আবার সেই রকম ঝড় উঠুক। বৃষ্টি নামুক।

ওরা দুজনে লড়াই করবে। দেখি,—পবন ঠাকুর কি করতে পারে? না হলে—দুজনেই গাঙের অতল জলে ডুবে যাবে—তাহলে এই ইচ্ছা —এই—সাধ! বিরোধ, উলানিপোকা, দালান, জমিন কোনকিছুই থাকবে না। একদিন তো—তাই হবে। নৌকা গাঙে ডুবে গেলে অন্য মাছ ধরতে পারবে না—তখন—তখন পুটলিকে ধরবার জন্যই গাঙের জলে হাবুডুবু খাবে।

● জীবন

বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করছি বছরের শেষে গোলার ধান কমে যায়। এই ব্যাপারটা মনের ভিতরে তোলপাড় করছিল। বাড়ীতে দুষ্ট লোকের অভাব নেই—হয়তো বা তাদেরই কারসাজি। একবার ইঁদুরের কথাও মনে হয়েছিল। কিন্তু ধানের গোলা খুব যত্নে তৈরী। ওদের সাধ্য নেই ভিতরে ঢুকে ধান পাচার করে। কিছুদিন ধরেই নজর রাখছিলাম কে নেয়। কার এত বড় সাহস।

বস্তুতঃ আমি জানি, ভয় দেখিয়ে লুঠতরাজ করে যা সংগ্রহ করা যায় তাতেই টাকা একদিন দেখব আমার ঘর, আমার উঠোন টাকার পাহাড় হয়ে গেছে। আমি সেই পাহাড় ডিঙ্গিয়ে শীর্ষ চূড়ায় উঠেছি। তখন হাজার হাজার মই লাগিয়েও আমাকে কেউ ধরতে পারবে না। অবিশ্যি এই ধারণা আমার রক্তে মিশে আছে। ঠাকুরদা যা জমি রেখেছিল তা খাটিয়ে বাবা তার দ্বিগুণ করেছিলেন—আমি তাদেরই বংশধর—ইতিমধ্যে চারগুণ ছাড়িয়ে গেছে। আমাকে দেখে সকলেই কুকুরের মতো লেজ নাড়ে—অনেকে বলে পিশাচ। আবার প্রয়োজনের সময় আমার পায়ের তলায় এসে মাথা খুড়বে। এদের বোঝা যায় না। কাজকর্ম করার ইচ্ছে একেবারে নেই। এমনি এমনি বসে থাকলে কি কেউ তোদের দালান তুলে দেবে ?

সেবার রামুদের জমির ধান নিয়ে আসবার সময় রামুর মায়ের সে কি কান্না! আর থামতে চায় না।

কাঁদছে আর চেঁচাচ্ছে, তোমাদের পায়ে পড়ি ধান নিও না। খাবো কি ? রামুকে নিয়ে কোথায় যাবো। কে দেখবে।

—দূর মাগী। চেঁচিয়ে বললাম।

লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে বললাম, যত সব ঢঙ। সে কি কান্না!

রামুর মা পা জড়িয়ে হাউ মাউ করে কাঁদছিল, বলছিল, এইবার মাপ করুন, বাবু। আপনার টাকা আমি দিয়ে দেবো।

তোমাদের চোখের জল আমি বুঝি। তোমরা কিছু পাওয়ার আশায় চোখের জল ফেল। চোখের জলের সঙ্গে তোমাদের পাওয়ার আর না পাওয়ার একটা নিবিড় সম্পর্ক যেন কোথাও আছে।

তোরা চোখের জল দিয়ে সবকিছু আদায় করতে চাস্।

আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি একটা কাক।

ফিরে যায়—ফিরে যায়।

একটা মিশমিশে কালো কাক বারবার উঠোন থেকে ফিরে ফিরে যায়। কিছু দূর চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে আসে। সাহস পায় না। উঠোনে ছড়ানো ধানের মধ্যে ঠোকর দেয়। কাকটা গলা ফুলিয়ে চারদিকে তাকিয়ে কিছুদূর আসে আবার ফিরে যায়।

বুঝিবা আমাকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু আমি তো নিজেকে সেভাবে প্রকাশ করছি না। তবে কি? দেখতে পেয়েছে। নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে। কাকটার হাবভাব দেখে সেই রকমই মনে হয়। কাকটা ফিরে যায়। আবার এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর অদ্ভুত শব্দ করে আর একটা শালিক এলো। কিচ কিচ করে অজস্র শব্দ তুলল। যেন বলছে, আমি আছি—ভয় কি? চল আমিও যাচ্ছি। পেটে খিদে—নিশ্চয়ই কেড়ে খাবার অধিকার আছে। ভয়-টয় করলে চলবে না। ও সব সাবেকী আমলের ধ্যানধারণা ছেড়ে দিয়ে আমি যা বলছি তাই শোন। আমরা তো অন্যায় করছি না। ও ব্যাটা জোতদার। ওর গোলায় অনেক ধান। খেতমজুরদের ঠকিয়ে, গুণ্ডা লাগিয়ে সংগ্রহ করেছে ঐ ধান। অবশেষে কাকটা এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এলো—এবার যেন ভয় নেই। টগবগিয়ে এলো!

ওরা বুঝতে পারছে না আমি গভীর অরণ্যের ব্যাধ। সেকালের

জমিদার। বৃটিশ আমলে কেউ আমাকে কাবু করতে পারে নি। বর্তমান সরকার ফন্দি-ফিকির করেও কোন মতেই আমার জমিন কেড়ে নিতে পারে নি। এ তল্লাটে সবাই ডরায়। আর ও তো পাখীর বাচ্চা। বাঘের ঘরে পা রেখেছে। তাই তো বলি আমার ধান চুরি কারা করে—এতদিন পর চোর ধরা পড়েছে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি কত ধানে কত চাল। যমের ঘরে পা রেখেছ—দেখাচ্ছি মজা! বলি—মানুষ, জীবজন্তু কি সবই চোর হয়ে গেল। কালে কালে দেশটা কি হলো। কাজ করে খাবে না। পরেরটা খেতে ওস্তাদ।

কাকটা ফুড়ুৎ করে কোথায় যেন উড়ে গেল। বুঝি বা পলিটিক্যাল দাদাদের কাছ থেকে জ্ঞান নিতে গেল। আবার এলো। এবার একটা নয়, কয়েকটা। ধানের কাছে এগোচ্ছে আর পিট্ পিট্ করে তাকাচ্ছে। আজকাল চারপাশের আবহাওয়া ভাল নয়। কখন যে কি হয় বলা যায় না। এসব কথা ভেবে বন্দুকটা তুলে নামিয়ে রাখলাম। আমার এই কাণ্ডকারখানা দেখে কাকটা মজা পেয়ে গেল। উড়ে যায়। আবার আসে। ভাবছি একটা প্রাণ নষ্ট করে কি হবে। কিন্তু বেয়াদপি সহ্য করা যাচ্ছে না।

বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরলাম। কা কা করে কাকগুলি উড়ে গেল। মনে মনে হাসি পেল। লাফানি-ঝাঁপানি সব শেষ! কিন্তু না—আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে কাক আসছে। আর সেই বিকট চীৎকার। কা-কা করে সমস্ত বাড়ীটা ঘিরে ফেলল—মানে ঘেরাও। ওদের দাবী অন্ন চাই, কাজ চাই, মাটি চাই। দালালগিরি চলবে না—চলবে না। গোলার ধান ছিনিয়ে নাও—ছিনিয়ে নাও। জোতদার নিপাত যাক্—নিপাত যাক্।

আমার চোখের সামনে দেখতে পেলাম লাঠি, বন্দুক, হাসুয়া নিয়ে হাজার হাজার কাক। যাদের জমি কেড়ে নিয়েছি, ধান কেড়ে নিয়েছি, তারাই এসে হাজির হয়েছে।

দূরে মিছিলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গম্ গম্ করছে। অনেকের

হাতে মশাল। আগুন। লাল রক্তের মতন আগুন। আসছে—দ্রুত এগিয়ে আসছে। আর রক্ষা নেই। এবার এতদিন বাদে ওরা ওদের ন্যায্য দাবী আদায় করবেই—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কাকটা আবার এলো। আরো কাছে এগিয়ে এলো। আবার উড়ে গেল। আমাকে বুঝি দেখতে পেয়েছে। চারপাশে অগণিত কাক। মনে হচ্ছে বাড়ীঘর, ধানের গোলা সবই লোপাট হয়ে যাবে।

গুলি করলাম—দুড়ুম্। ফাঁকা আওয়াজ। এবার যেন আকাশ ভেঙ্গে গেল। দিশাহারা হয়ে গেলাম। খেই হারিয়ে ফেললাম কি করব। কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। ধানগুলির দিকে তাকিয়ে কান্না এলো। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে আমার সাধের ধান। কাকগুলো তখনও কা কা করছে। কখন যেন বেলা শেষ হয়ে এলো খেয়াল নেই। অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। এক সময় কাকের কা কা রব থেমে গেল। গাছের ডাল এলোমেলো। হাওয়া নেই। স্তব্ধ! চারদিকে কেমন নিরালা, নিঝুম।

আমার দেহ অবসন্ন। মাথা ঘুরছে। পা টলছে, কি করব। কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। উঠোন ভর্তি ধান। কানে যেন অবিরাম গুলি চলছে। তক্ষনি রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কি হবে। কিছুই না।......

ছড়ানো ছিটানো ধানের মধ্যে নতজানু হয়ে বসে কাঁদতে লাগলাম! কেমন যেন সমস্ত বাড়ীঘর ঘুরতে লাগল। ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। এক্ষুনি পৃথিবীর সমস্ত কিছু উলটে পালটে যাবে।......

• প্রতীক্ষা ও কয়েকটি মুখ

কথামুখ

কারখানার দেওয়ালে বিভিন্ন রকমের পোস্টারের কথাগুলি লাল অক্ষরে জ্বলজ্বল করছিল। পথচারীরা একবার দাঁড়িয়ে দেখছিল। কেননা এই নৃশংস ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। প্রতিটি শ্রমিক প্রতিটি নাগরিক শুনে মর্মাহত। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে মেহনতী জনতা। সামান্য ঘটনা। সকালের শীফটে শ্রমিকেরা কাজে যাচ্ছিলেন। গেটে মিটিং হচ্ছিল। কমরেড বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—। সভাশেষে দারুণ ভীড়। কে আগে-ভিতরে ঢুকবে, কেননা ততক্ষণে গেট বন্ধের হুটার বেজে গেছে।

কর্তৃপক্ষ দরজা বন্ধ করবেন। শ্রমিকেরা বলছেন—পাঁচ মিনিট খোলা রাখতে। এই নিয়ে বচসা। তারপর অর্ডার হল—গুলি, গুড়ুম।

চারদিকে একটা হৈ-হৈ কাণ্ড বেধে গেল। সকলের মুখে আতঙ্ক-প্রশ্ন? কি হল। গুলি কেন করল। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। চারজন শ্রমিক বন্ধু নেই। গুলিতে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বেশ কিছু সংখ্যক। মুহূর্তেই খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মৌন হয়ে গেল কারখানা—চোখের জলে বুক ভেসে গেল সহ-কর্মীদের।

পুলিশ এলেন। মন্ত্রীরা এলেন। শ্রমিকদের শান্ত হতে বললেন। শ্লোগান দিল—রক্তের বদলে রক্ত চাই। আকাশে বাতাসে গুমোট গরম পরিবেশ। থমথম করছে সমস্ত পরিস্থিতি এখনই ঝড় উঠবে। কিন্তু তেমন কিছু হল না—মিছিল বের হল। বিরাট শোক মিছিল।......

এই ঘটনার অন্তপিঠে চারজনের ঘটনা বলছিলেন ফিটার ইয়াসিন

মিএল। সত্যাসত্য যাচাই করবার সময় ছিল না। তখন আমরা মানুষের মধ্যে কেউ ছিলাম না।······

প্রথম জন

দিনের শেষে যে যার কর্মস্থল থেকে ঘরে ফিরছে। পরিশ্রমের দেহ ক্লান্তিতে অবসন্ন। জানালায় দাঁড়িয়ে শৈলবালা রাস্তা দেখছিল। এখনো একজন আসেনি। অন্যদিন এই সময় এসে যায়। ভাবল—কাজে আটকে গেছে কিংবা কোন বন্ধুর বাড়ী হয়ে আসছে। হতেও পারে। রাস্তায় বেরুলে ঘরে ফেরা না পর্যন্ত স্বস্তি নেই। আজকাল রাস্তাঘাটের যে দুরবস্থা। একটা না একটা দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। সোনার টুকরো হীরের টুকরো ছেলেরা সব বাদুড় ঝোলা অবস্থায় বাসে ট্রামে যাতায়াত করে, ভাবনার বিষয়। উঃ কল্পনা করা যায় না। শৈলবালা কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলল ঃ ইলেকশন এলেই চেঁচায়—এই করবো সেই করবো, কাজের বেলায় নবঘণ্টা। বসে-টসে যে কাজে যাবে তার উপায় নেই। যত রাজ্যের লোক, কলকাতায় এসে মরেছে।

কথাগুলি খালি ঘরে গুমগুম করছিল! কিছুতেই চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে পারছিল না। একবার জানালায় একবার দরজায় আসছিল-যাচ্ছিল। ছেলে ঘরে না আসা অবধি চিন্তার শেষ নেই। আজকে আরো বেশী চিন্তা মাইনের দিন। টাকা যদি এদিক সেদিক হয় তাহলে মরণ। বলতে গেলে একজনের ওপর সংসার। কল্পনা, শান্তার স্কুলের বেতন। বাড়ী ভাড়া র‍্যাশন। যাবতীয় সব। চিন্তার কথাই। এখনো এল না। এত দেরী তো কোনদিন করে না। তবে কি কোন অঘটন ঘটল! যাবার সময় বলে গিয়েছিল—মা, চন্দনকে মাংস আনতে বল। মাইনে পেয়েই দিয়ে দেব। দোকানদারকে বলে রেখেছি। প্রথম দিন ভালমন্দ খাওয়ার অভ্যেস অনেকদিনের কেননা অন্যান্য দিন তো ডাল ভাত। শৈলবালা যত্ন করে রান্না করে

রেখেছে। সকাল-সকাল বাড়ী এসে যে খাবে সে ভাবনা নেই। সময় যেন শেষ হতে চাইছিল না। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছিল। আজকে এলে দু'চার কথা বলতেই হবে মনে মনে শৈলবালা ঠিক করল—আদর দিতে দিতে মাথায় উঠে গেছে।——

দ্বিতীয় জন

বাণী-বন্দনা বিকেল বেলায় বেড়াতে গিয়েছিল। মানে অমলের জন্য সার্টের কাপড় কিনবার দরকার ছিল। এক কাজে—দুই কাজ। অমল বাড়ীতে এলে অবাক করে দেবে—কাপড়টার কি বাহার। দারুণ মানাবে। এই ভেবে পুলকিত হল। বস্তুত বিয়ের পর অমলকে কিছু কিনতে দেয়নি। বাণী বন্দনাই সব করেছে। ঘরের আসবাবপত্র থেকে আরম্ভ করে সাজান-অবধি। টেবিলটা কোথায় বসালে ভাল হবে। বুকসেলফ কোনদিকে থাকবে ইত্যাদি—ইত্যাদি।—

এসব ব্যাপারে অমলের কোন মাথাব্যথা নেই। মাস গেলে টাকা দিয়েই খালাস। ওদের মধ্যে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি নেই। সুখের সংসার। ঘরে ফিরে কেমন যেন শূন্য শূন্য লাগল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাইরের রাস্তায় কিসের যেন গোলমালের শব্দ। এখনো অমল আসছে না কেন? অন্যদিন তো এত দেরী করে না। কারখানা ছুটি হয়ে গেছে—কখন। কোথাও গেল নাকি! কোথায় যাবে ছুটির পর কোথাও যায় না। সরাসরি বাসায় আসে—গেলে বলে যায়।

তবে কি ইচ্ছে করে গলির মুখে আড্ডা দিচ্ছে। পরীক্ষা করছে—চিন্তা করি কিনা! এইসব সম্ভব অসম্ভব নানা কথা ভাবছে। অথচ সময় যেন যাচ্ছিল না। নিজের মনকে প্রবোধ দিয়েও কেন যেন চোখের জল মানাতে পারছিল না। হু-হু করে বন্যার মত আসছিল। সবে মাত্র তিন মাস বিয়ে হয়েছে। মনে হয় দীর্ঘদিন। খবর নিতে

পাঠাবে তেমন কেউ ঘরে নেই। কি করবে। বিছানায় দেহ এলিয়ে বালিশে মাথা রেখে অমলের ছবিটা দেখতে লাগল।

তৃতীয় জন

বাড়ীতে ভাইবোন ছাড়া আর কেউ নেই। বড়বোনের ওপরেই সংসারের দায়-দায়িত্ব। মঞ্জু তাতে একটুও দুঃখিত নয়—খুশী। অবিশ্যি পাড়ার লোকেরা বলে মা-বাবা যখন বিয়ে দিতে পারল না। ছোট-ভাই কি করে বিয়ে দেবে। সংসার চালিয়ে কিছু থাকে না। বিয়ে দিতে হলে টাকার দরকার। সুরেন্দ্র ভাল ছেলে—ভাইবোন বলতে অজ্ঞান। আজকাল এমন ছেলে দেখা যায় না। বড় বোন মঞ্জু যা বলবে—তাই করবে। সেদিন মঞ্জু কথায় কথায় বলছিল—সামনের বোশেখে সুরেনকে বিয়ে করাবো। দেখে-শোনে নিজের সংসার গুছিয়ে নিক! আমি আর কতদিন।

ঘরে বৌ-ঝি না থাকলে মানায় না। খালি খালি লাগে। বস্তুত নিজের বিয়ের কথা বললে—রেগে যায়। বলে—আমি বিয়ে করলে ওদের দেখবে কে? এদের কার কাছে রেখে যাব। বাবা-মা যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তা পালন করতেই হবে। গার্জেন বল, দিদি বল—আমিই তো সব। ওদের আর কে আছে।

মঞ্জুর ঐ রকমই কথাবার্তা। দেখলে মনে হয় কিছুটা রুক্ষ প্রকৃতির আসলে তা নয় বয়সের জন্য ও রকম মনে হয়। ভাইবোনের জন্য পাগল। ছোটভাই বরেনকে অফিসে পাঠাল। খবরের আশায়। এখনো আসছে না—সেই চিন্তায় মঞ্জু অস্থির। এত রাত কোনদিন করে না। কি যে হল। ঠাকুর দেবতাকে মানত করল। যাতে ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে। কোথাও গেলে বাড়ীতে তো বলে যেতে পারে। আসুক। আচ্ছা করে ধোলাই দিতে হবে। সুরেন্দ্র যে আর ছোট নেই—সে কথা একবারও ভাবল না—নিজের মনেই গজরাতে লাগল।

চতুর্থ জন

ঘরে পা দিয়েই অরবিন্দুবাবু বললেন—হরি আসেনি।

ছোট বোন রত্না উত্তর দিল—না।

—এলে খবর দিস। দরকারি কথা আছে। বলেই ঘরের লাইট অফ করে দিলেন। কদিন থেকে ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখেন না। অন্ধকারে বসে যেন কিসের চিন্তা করেন। বয়স্থা মেয়েদের চিন্তা হতেও পারে। একজনকেও এখনো নামাতে পারেন নি। টাকা কোথায়? হরি যা পায় তা দিয়ে তো সংসার চলে না। মেজ সেজ টিউশনি করে। খরচ তো কম নয়। হরিকে কেন ডাকছিলেন রত্না বুঝতে পারলো না। কোনদিন তো খবর নেন না। কখন এল, কি খেল। কিছুই না। একটা মানুষ যে রাতে বাড়ী থাকে তাও জানেন না। অথচ আজকেই হরি বাড়ীতে ফিরতে দেরী করছে। কোনদিন এমন হয় না। অরবিন্দুবাবু আবার ডাকলেন—হরি। ও হরি। কেউ উত্তর দিল না। মানে কেউ উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না।

আবার নিস্তব্ধতা। নিঝুম অন্ধকার। চারিদিকে দমকলের ঘন্টির শব্দ পেলেন। বুঝিবা হাট বাজার পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তখনো দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। চেঁচাচ্ছে জল নেই জল দাও। মানুষ নেই মানুষ দাও।

উপসংহার

দ্রিম দ্রিম মাদলের শব্দ শোনা গেল। অসংখ্য টিকারার শব্দ। রাত্রির আকাশ চিড়ে একটা কালো পাখী ভূত-ভূতুম ডাকছিল। হাজার হাজার শকুন কালো হয়ে কলকাতার শহরে নেমে এল। চারপাশে রক্তের বন্যা। রক্ত। রক্ত। প্রতিবাদ মিছিল। প্রতিরোধ মিছিল। স্লোগান—রক্তের বদলে রক্ত। হত্যাকারীর বিচার চাই।

বুকফাটা চীৎকার। কান্নায় ঘর বাড়ী ভাঙ্গছে। হাটে বন্দরে মৌন মিছিল। সকলের মুখে প্রশ্ন। নরখাদক, জল্লাদের শাস্তি চাই। মুণ্ডু চাই। কি ঘটেছিল গুলি চালাল। বাপের বয়েসেও কেউ শোনেনি কারখানায় গুলি চলেছে। আহা! যাদের গেল তাদের চিরদিনের মত গেল। হীরের টুকরো, সোনার টুকরো ছেলেদের ফিরিয়ে দিতে পারবে—পারবে না।

● বিতদ্রু : দেবদারু : চড়ুই

দেবদারু গাছের নীচে চড়ুইপাখিগুলো তখন থেকে কিচিরমিচির কিচিরমিচির করছে। কোথাও স্থিরভাবে এক মিনিটও বসছে না। আশেপাশে কি ঘটেছে কেন ঘটেছে সে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিতদ্রু রোজই ভাবে দেবদারু গাছটা কেটে ফেলবে। হরদম কিচিরমিচির কতক্ষণ সহ্য করা যায়! চুপচাপ বসে থাকার কোন উপায় নেই। এদের কোন অতীত নেই ভবিষ্যৎ নেই। বেশ আছে বর্তমানকে নিয়ে। অতীতকে নিয়ে অনুতাপ করে না। কেননা ওরা জানে আজকে যা ঘটেছে, আগামীকাল, আগামীকালের পরের দিন, তার পরের দিন, অতীত হবে। এটা ঘটনা। আর ভবিষ্যৎ সে তো চিরকালই অনাগত।

রাস্তা দিয়ে চললে পলাশের কথা মনে পড়ে। অথচ ওর কাছে কোনদিন যেতে পারলাম না। ওর কাছে বিপ্লব চিঠি দিয়েছে শীঘ্রই অবহেলিত নিপীড়িত মানুষের জন্য কাজ করবে। মানুষ মানে বিতদ্রু। বিতদ্রু মানে আমি। আমি মানে তুমি। তুমি মানে আমরা।

বিপ্লব আরো লিখেছে দেবদারু গাছটা না কাটতে। চড়ুই পাখিগুলো না তাড়াতে। এদেরও প্রয়োজন আছে। কোনকিছুই নাকি অর্থহীন নয়।

পলাশ বিশ্বাস করে চড়ুইপাখি মনের বসন্ত। রঙ নেই অথচ সর্বদাই কি যেন খুঁজছে—হয়ত বা আগ্নেয়গিরি। এই ধারণার জন্য ভাল লাগে। তাড়ানো যায় না।

এই কবিপক্ষে আমার তিরিশ বছর শেষ প্রায়। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষকতা, পত্রিকা অফিসে চাকরি, কিছুকাল কারখানায় ছিলাম। মার্চেন্ট অফিস, মুদি দোকান বিজ্ঞাপন সংস্থা—মানে কোথাও দু'বছর

একনাগাড়ে থাকিনি। একটার পর একটা। লাটিমের মতো ঘুরছি। হাজার হাজার পলাশের সঙ্গে, বিপ্লবের সঙ্গে মিছিলে গিয়েছি। সভা করছি। শেষপর্যন্ত কেউ তেমনভাবে থাকেনি। যে যার জায়গায় চলে গেছে। সেইজন্য আমার তেমন কোন অতীত নেই যা দু দণ্ড ভাবায়। বর্তমানকে নিয়েই আমার সব।

যখন যে রকম ভাবা যায় ভাল লাগে। আসলে গাছের প্রতি আমাদের দুর্বলতা আছে। গাছের ডালপালা ভালবাসে না এমন লোক পৃথিবীতে নেই বললেই চলে। দুঃখ পেলে গাছের দিকে একদণ্ড তাকিয়ে থাকলে প্রশান্তি এনে দেয়।

ধূ ধূ করে বিস্তীর্ণ মাঠ। আশেপাশে কোন গাছ নেই। কি রুক্ষ দৃশ্য। এই পরিবেশে একটা বটগাছ থাকলে দারুণ—ভাবা যায় না।

ক্ষেতে যে কাজ করছিল সে গাছের নীচে বসে সাত মহলার কথা ভাবে, নবান্নের কথা ভাবে; কি হবে না হবে সেই কথা ভাবে না।

এই গাছ আমাদের সংগে জড়িত। আত্মীয়ের মত। ইচ্ছা করলেই কাটতে পারি না। কাটা মানেই খুন করা। আমরা কি কোন মানুষকে হত্যা করতে পারি, অমানুষ হলে পারি।

সেইরকম অমানুষ হলে গাছ কেন অনেক কিছুই করতে পারি।

দেবদারু গাছটা ফাগুনে একরকম। আষাঢ়ে অন্যরকম। যখন যে রকম ভালো লাগে।

চড়ুইপাখিগুলোর ঋতু নেই। সরলরেখার মতন। আমার মত বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত নয়।

এই সময় চড়ুইপাখিগুলো কাছের মানুষ হলেও পুরোপুরিভাবে নয়। ইচ্ছে হয় ওদের তাড়িয়ে দিই। দেবদারু গাছটাকে কেটে ফেলি। পাশাপাশি এই সহাবস্থান অসহনীয়।

সাবেকি আমলের ঘর, রাস্তা, ঘর ভেঙে—ভাঙার পর সমবেতভাবে

গড়ে উঠুক নতুন ঘর নতুন রাস্তা। পলাশ বিশ্বাসকে ডেকে আনবেই। বিপ্লবের সহচর বিশ্বাস।

কেননা নদী যেমন সমুদ্রের সংগে জড়িত। একজন ব্যতীত অন্যজন বাঁচতে পারে না। এই ব্যাপারটা তিন সত্যি।

ধানক্ষেতে আগুন লাগলে হাওয়ায় চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। লকলকিয়ে গাছ ছাড়িয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়ায়, দমন করতে মানুষই এগিয়ে আসে। তাদের বিশ্বাস আছে এই ভয়াবহ আগুন আয়ত্তে আনতে পারবে।

এই বিশ্বাস রয়েছে বলেই মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দু'জনেই পাশাপাশি রয়েছে। একই গাছের ডালে দুষ্ট পাখিও বসে সুখ পাখিও বসে।

ফুটপাথে যেজন যায় সে আবার ডান ফুটপাথ দিয়ে কিছুক্ষণ পরেই ফিরে। এই যে যাওয়া-আসা চিরকাল চলে আসছে। বহতা নদীর মতন।

নদী যেমন ডান পাড় ভাঙলে অন্যদিকে ভরাট করে। বন্যায় বাড়ীঘর ক্ষেত ফসল নষ্ট হলেও আবার এই বন্যার ফলে দেশ উর্বর হয়। আসলে ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ।

আলোর নীচেই অন্ধকার। এই প্রবাদ বাক্য আমাদের সকলের জীবনেই সমান। কখনো কারোর জীবনে দুরন্ত ভাবে কারো জীবনে ম্লান। আর এই খেলায় আমরা কমবেশী সকলেই অংশ গ্রহণ করছি।

আমি ওদের বোঝাতে পারি না তারিয়ে তারিয়ে পারাপার হতে চাই না। এখনই এখানে অতীত মানে বর্তমানে মানে অতীতকে ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে ফেল। সাঁকোর জন্য মায়া করে কিছু হবে না।

বিতক্র লাফিয়ে উঠল। তখন বিকেল। চড়ুইপাখিগুলো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়ছে নামছে। অতীতে কি ঘটেছিল, বর্তমানে কি ঘটেছে এবং

ভবিষ্যৎ কোন কিছুই ভাবছে না। কেবল কিচিরমিচির। না, এ চলতে পারে না। অসম্ভব।

বিতক্র কুড়াল নিয়ে দৌড়ে দেবদারু গাছটার কাছে গেল। কুড়াল ওঠাল। কাটবে। কিন্তু পলাশ। আবার পলাশ। দীর্ঘদিনের গাছ। কত ইতিহাস।

পলাশ···তুমি কেন···তুমি···আবার কেন

তুমি···তোমার···বিশ্বাসের···কাছে···যাও

পলাশ···পলাশ···সরে···দাঁড়াও

এইবার···এইবার···এইবার···কোপ মারবো

বিতক্র কুড়াল তুলতে পারল না। হাত কাঁপল। চিকন চিকন দেবদারু গাছের পাতায় ঝলমলে রোদ। বিতক্র দেখল মগডালে অসংখ্য পাখির বাসা। পাখিদের ঘর। তরতাজা ডিম। নিশ্চয়ই বাচ্চা রয়েছে।

পলাশ বলল ঃ ঘর ভাঙলে ঘর হবে। গাছ কাটলে গাছ হবে। সুতরাং তুমি পালাবে কোথায়? এই দেবদারু গাছের নিচেই আসতে হবে। কেউ কখনও আশ্রয়হীন হয়ে বাঁচতে পারে না।

চড়ুইপাখিগুলো কিচিরমিচির বন্ধ করে কাণ্ডকারখানা দেখছে।

বুঝি বা সমবেত আক্রমণ চালাবে।

বিতক্র কুড়াল রাখল। সেই সময় হাঁফাতে হাঁফাতে বিপ্লব এসে দাঁড়াল। বলল ঃ আমি এসেছি। বিতক্র ওকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরল।

···তখনি আরম্ভ হয়ে গেল কিচিরমিচির কিচিরমিচির কিচিরমিচির।

• কাছিম

ভাদ্রের দুপুর।

ছড়ান-ছিটান চারদিকে মুঠো মুঠো কাঁচাসোনা রোদদুর। নীল-কণ্ঠ আকাশে টুকরো টুকরো ভাসমান মেঘ-পাহাড়-পাহাড় মেঘ। দূরে-অদূরে বাড়ীগুলি জলের মধ্যে ডুবছে। উঠোন ছুঁই-ছুঁই-জল।

পুকুর, ধানক্ষেত জলে একাকার। সবুজ ধানগাছগুলি লকলকিয়ে উঠছে নামছে। হিজল বনে কোমর জল। জল ঝিম ধরেছে। অমাবস্যার জো গেলেই টান-ধরবে। জল ধলেশ্বরীতে নামবে। বড় পুকুর পাড়ে হিজল গাছে টেঁটা নিয়ে মাছরাঙার মত বসে আছি। গাছের ডালপালা জলেব উপরে হেলান। একটা নীচু ডালে ইঁদুর পোড়া দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

কোসা নৌকাটা পাশের ধানক্ষেতে লুকানো।

কালো জল থির। শীতলপাটি বিছান যেন। চারদিকে পোড়া ইঁদুরের মৌ-মৌ গন্ধ। আর সেই সুগন্ধের জন্য হেলে দুলে আসবে বোয়াল।—গড়িয়ে গড়িয়ে আসবে কাছিম। ভাবে কি সুগন্ধ খাবার। কি লোভনীয়। অথচ খেতে পাচ্ছে না। গাছ থেকে সব সাফ-সাফ দেখা যায়। কাছে এলেই টেঁটা ছুঁড়ে মারবে, তারপর বাছাধন—জন্মের মত।

কাছিম মারার এই তো সময়।

মাছরাঙার মত সেই জন্তেই বসে আছি, কখন আসবে কখন মরণ ফাঁদে পা দেবে আর দিলেই খতম।

বসে থাকলে কি হবে। আমি জানি ছেন্টুর মত মারতে পারি না। আঁইস নেই। তবু চেষ্টা করি—কেননা লোভটা তো ছোট নয়—বড়ই।

সকালেও ডিঙি নৌকা নিয়ে পিঙ্গলিদের ঘাটে গিয়েছিলাম। ওদের ঘাটেই বাইলা, পুঁটি, ট্যাংরাদের ভীড়, মধুর লোভ কি আর সামলাতে পারে। এত থাকতেও ধরতে পারি না। ছেন্টু পটাপট ধরে। বাইলা আধার না খেলে শুধু বঁড়শিটা কানসার কাছে রেখে এমনভাবে টান দেবে যে মাছ উঠবেই। আশ্চর্য ব্যাপার। অথচ আমার আধার তিত পুঁটিতেই ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খেয়ে ফেলে অথবা মস্ত বড় একটা বাইলা শুয়ে আছে—নাক চোখ টলটলে জলের মধ্যে দিয়ে দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। আস্তে ধীরে মুখের কাছে আধার নিচ্ছি। লাল-লাল গোল-গোল চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকার পর খপ করে গিলেই বের করে দেয়। টান দেবার আর সময় দেয় না। এই যে মাছ ধরতে জানি না তাতে কোন লজ্জা নেই। আশায় আশায় থাকি আজ না পেলে কাল পাবই। মাছ যে ধরতে পারি না, টান দিলে যে মাছ ওঠে না পিঙ্গলি ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা লক্ষ্য করে এবং খিল-খিলয়ে হেসে লুটিপুটি খায়।

কখনো-সখনো ছেন্টুর ওপর ভীষণ রাগ হয়। ইচ্ছে করে জলের মধ্যে চুবাই কিন্তু কিছুই করা হয় না। একই সংগে ছোট থেকে বড় হয়েছি। গলায় গলায় ভাব। যেখানে যাই ছেন্টু সেখানে থাকবেই। ইদানিং ছেন্টুর ওপর রাগ যেন বেড়েছে। মুখে কিন্তু বলতে না পারলেও ভিতরে ভিতরে বিরাট একটা দেওয়াল গড়ে উঠেছে। পিঙ্গলির যেন ছেন্টুর দিকেই টান বেশী। অবিশ্যি আমার সংগে মাঝে মাঝে দু' একটা কথা বলে, সহজে কাছে ঘেঁসে না। ইচ্ছা করে দু'টোকেই পলোর মধ্যে রাখি।

পিঙ্গলি সবে মাত্র কাপড় পরেছে। সাদা সাদা রঙ। দোহারা গড়ন। ঢলো-ঢলো শরীর। গায়ে জামা নেই। চেকজুঙ্গির মত কাপড় পরণে। লাবণ্যে ভরা দেহ। যখন হাসে নদী যেন পাড়ে উপচে পড়ে।

বসন্ত বর্ষায় এক সঙ্গে কানামাছি, কড়ি-লাড্ডু, একাদোকা গোল্লা

ছুট খেলেছি কিন্তু একবারও জিততে পারিনি। হারাতে পারিনি ছেণ্টু সহজেই পিঙ্গলিকে হারাতে পারতো, পিঙ্গলি যেন হেরে যাওয়ার জন্যই বসেছিল।

দূরে একটা বিরাট ঘাই দিল—বিরাট কোন মাছ হবে। বর্ষার জলে মাঠ পুকুর এক হয়ে সমুদ্র হয়েছে। সবুজ সবুজ ধানগাছগুলি লকলকিয়ে মাথা দুলিয়ে নাচছে। রোদ যেন তার উপর দিয়ে থির থির করছে। প্রকাণ্ড নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ দূরে বহু দূরে ভেসে যাচ্ছে। ঝপ করে একটা পানকৌড়ি পুকুরে নামলো। শব্দ পেয়ে ডাহুক কচুরিপানার ভিতর দিয়ে ধানক্ষেতে গেল। জলের নীচে চোখ রেখে দেখলাম দু' একটা ছোট ছোট শোল-গজার ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। ওদের লাল চোখগুলি জলের মধ্যে পিট পিট করছে।

স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাছাধনেরা তো জানে না টেঁটার কোপ খেলে পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে। নাড়িভুঁড়ি ছত্রখান হয়ে যাবে! একবার বাগে পেলেই হয়, ঝামেলা পরিষ্কার করতে কতক্ষণ ছেণ্টুও রক্ষা করতে পারবে না। ভাবে ওই বুঝি ভাল খেলতে জানে—আর কেউ জানে না কিন্তু সুযোগ হচ্ছে না ওকে হারাবার জন্য!

ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। পিঙ্গলি কিম্বা ছেণ্টু বুঝতে পারতো কিনা জানি না—বুঝতেও দিতাম না। কেননা ওরা দু'জন সহপাঠি, সমবয়সী হলেও বুদ্ধি দেহ সবকিছু—সবকিছুতেই বড় ছিলাম। অনুভূতি, ইচ্ছা, চতুরতা ব্যাপারগুলি জানা থাকা সত্ত্বেও পিঙ্গলির নাগালের বাইরে আলো ছায়া-ছায়া আলোয় বিচরণ করতো। অসহায় বালকের মত পিট-পিট করে পিঙ্গলির বোয়াল মাছের মত ভরাট দেহ, শাড়ীর ভাঁজ, পুঁটি মাছের মত চোখ, ইলিশ মাছের মত গায়ের রঙ। দীঘল চুল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে অন্য জগতে চলে যেতাম।

বাপ্পু ইসরে···।

একটা বিরাট বোয়াল হেলে-ঢুলে মোটা সুতোয় ঝুলনো সুগন্ধি বস্তুটার দিকে এগিয়ে আসছে। আর তা দেখা মাত্র মুখ দিয়ে বেড়িয়ে গেল—বাপ্প্ ইসরে! হালার পো হালা কাছে আয়···আয়।

ডেমনা খাওনের সখ কত? আর একটু আউগালেই ট্যার পাবি।

বোয়ালটা এগিয়ে আসছে। হেলে-ঢুলে আসছে। টেঁটা ঠিক করে বসলাম। টেঁটার কাইলা পাতায় লাগামাত্র সর-সর শব্দ হোল। হিংস্র শ্বাপদের মত ওঁৎ পেতে বসে আছি। এলেই টুঁটি চেপে ধরবো। পলকহীন চোখে বোয়ালটা দেখছি। নাদুস-নুদুস সোনার চান হেলে-ঢুলে জল কেটে জল কেটে নির্ভাবনায় তরতরিয়ে এগিয়ে আসছে।

ধলেশ্বরী গাঙ থেইক্যা আসতেছেন নাকি?

নাকে পাট পচা গন্ধ! বেশ আঁশটে আঁশটে গন্ধ!

খাড়ন!

টেঁটা উঠিয়েছি। কোপ মারবো।

ভুস করে শব্দ হল। সুগন্ধি বস্তুটার কাছেই জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। একটা কালো কাছিম জলে ভাসল। চারিদিকে ঢেউ ভেসে গেল। জল ছড়িয়ে গেল। তক্ষুনি বোয়ালটা উধাও হয়ে গেল।

ব্যাপারটা ঘটে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। এত নিশানা এত পরিশ্রম সব পণ্ড হল। আর পারচি না বসে থাকতে। পায়ে ঝি ঝি লেগেছে। বুড়ো আঙুলে চিমটি কাটলাম।

হিজল পাতার ফাঁক দিয়ে পিঙ্গলিদের বাড়ী দেখা যায়। বাড়ীটায় চারিদিকে হিজল, চালতা আর গাব গাছে ভর্তি। ঝোপে ঠাসাঠাসি।

দেবদারু গাছের মাথা আকাশে ঠেকেছে।

চকের মধ্যে বাড়ীটা থাকার জন্য দ্বীপের মত মনে হচ্ছে। চারিদিকে ফসলের ক্ষেত। হিজল বন জলে একাকার। বাড়ীর নামার পালানে ঘাস কলমি হিলাঞ্চা, সাপলা কাইচলার এদিক ওদিক দাম

বেঁধে রয়েছে। মাঝে মধ্যে তাওয়া, দু'একটা ধান গাছ রয়েছে : আর সেখানেই ঝাঁকে ঝাঁকে নলা আসে—ফাঁকা যায়গা পায় কিনা—উয়াস ছাড়ে, জল চাবায়। দম ছাড়ে—শ্যাওলা খায়। তখনি টেঁটা দিয়ে চড়া রোদ মাথায় নিয়ে মাছ ধরা সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

ডিঙি নৌকার গলুইতে টেঁটা নিয়ে বসেছি। আস্তে ধীরে এগিয়ে দিচ্চে ছেণ্টু—যেন শব্দ না হয়। স্যাওলা বইচা আর সাপলা বনের মধ্যে নৌকা তাড়াতাড়ি যেতে পারে না। নিরিবিলি বলে এই জমিতেই নলাগুলি জল তাওয়ায়। মানে জল খায় এবং তা দেখে দূর থেকে তাক করে টেঁটা মারতে হয়। কোপ মারলে কি হবে। ছর···ছর···শব্দ করে নলা কেটে বেরিয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েও ধরতে পারি না। রূপোর টাকার মত আঁইশটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে—চিক চিক করে।

পিঙ্গলি ঘাটের তক্তায় পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে—দেখে। ইচ্ছে হত ওকে দেখাই মাছ মারতে পারি, ধরতে পারি কিন্তু মাছগুলি পাঁজি··· নচ্ছার। অবশেষে ছেণ্টুকেই গলুইতে আসতে হোত।

মাছ না ধরলে পিঙ্গলিকে কি দেওয়া হবে। ছেণ্টু কোপ মারলেই টেঁটা ঘুরতো এবং আঁইশটা এদিক ওদিক ছিটতো তবু দুই একটা থাকতোই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নৌকার খোপ ভরে যেত। পিঙ্গলিদের ঘাটে এলে বলতো : খালুই ভর্তি কইরা দিতে হইবো।

ছেণ্টুকে কোন কথার উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই বলতাম : দুইড্যা খালুই লইয়া আয়—ভইরা দিমু, খাড়।

পিঙ্গলি আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলতো : ছেণ্টু বিকালে আহিছ—কানামাছি খেলুম।

পিঙ্গলির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তখন ইচ্ছে হোত দুটোকেই জলের মধ্যে চুবাই বা ঝাকি জালের মধ্যে বেঁধে রাখি।

ছোট হতে হতে ঢেউ চলে গেলে জলের দিকে তাকালাম। একটা

গাঙ ফড়িং জলের ওপরে উড়ছে। তাই দেখে ফড়িঙ ধরার কথা মনে পড়লো। সকাল থেকেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ঝপ···ঝপ ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি। সিলেট ধোঁয়া আকাশ পরিষ্কার হয়ে ফরসা হয়েছে, রোদ্দুর উঠেছে। বাড়ীর উঠোনে পাট নেওয়া হচ্ছে। পাশেই পাট সোলার আঁটি।

শুকাবার জন্য রাখা হয়েছে। ভাঙ্গা পাটকাটি এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। সেখানে লাল-হলুদ ফড়িঙের মেলা। কাছে গেলে মম-মর-চড়-চড় শব্দ হলে ফড়িঙ চলে যাবে সেইজন্য একটা পাটকাটি নিয়ে সামনে রাখলেই ফড়িঙ উড়ে উড়ে এসে বসে, আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে আনি ধরবার জন্য যাতে উড়ে না যায়। আর একটু আর একটু হলেই হাত দিয়ে ধরতে পারবো, যা ! উড়ে গেল। ধরতে পারলাম না।

পিঙ্গলি পাট নিচ্ছিল, আমার কাণ্ড কারখানা দেখে খিলখিলিয়ে হেসে ফেলল। ওদের জমিতে পাট হয় না। আমাদের বাড়ীতে পাট নিতে আসে। যা নেবে তার অর্ধেক পাটকাটি সে পাবে, এই নিয়ম। পিঙ্গলির হাসি দেখে রাগ হল। পাট নিতে আমিই খবর দিয়েছি আর ও কিনা বেহায়ার মত হাসছে। কই ছেন্টুদের বাড়ীতে পাট নিতে বলো না তো ? রাগ হোল। কাছে গিয়ে বললাম ঃ বত্রিশ পাটি দাঁত বাইর কইরা হি হি করতে হইবো না। হাসি দেখলে পিত্তি জ্বইলা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ঠানদিদির মত উত্তর দিল—একশোবার হাসুম। এত বড় পোলা ফড়িঙ ধরতে পারে না। মাইনসে হাসলেই দোষ। সখ থাকলেই ধরন যায় না—হিকন লাগে।

ঃ তর কাছে হিখুম নাহি।

ঃ কেডা হিখায়।

গর গর করে কথার উত্তর দিয়ে ফড়িঙের মত পাট নেওয়া ফেলে দিয়ে উড়ে চলে গেল সে।

জলের দিকে চোখ পড়তেই থ হয়ে গেলাম। ইয়া বড় একটা কাছিম। চার চার হাত দিয়ে বৈঠার মত জল কেটে—জল কেটে সুগন্ধ বস্তুটার দিকে এগিয়ে আসছে। লম্বা মুখ। গোল গোল চোখ। বুকটা ধবধবে সাদা। চৌকো দাগ কাটা পিঠ মিশমিশে কালো জলে হাত-পা ছড়িয়ে আসছে। আর···আর এক হাত এগুলেই মারবো, টেঁটা তুলেছি। হঠাৎ কোথা থেকে একটা গজার তড়াং করে লাফিয়ে চলে গেল। গজারের শব্দ পেয়ে কাছিমটা ডুবে গেল।

গজারের মাথায় সিঁদুরের ছোপ। পিঙ্গলি কপালে যে রকম টিপ পরে সেই রকম। একটু দূরে আর একটা কাছিম। পা দিয়ে জল কেটে জল কেটে স্থির—নট নড়ন-চড়ন। গজারটা কি সেই ভাবেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কোন্‌টা মারবো কিভাবে মারবো এইসব ভাবতে ভাবতে দেখি একটা বোয়াল দাড়ি নেড়েচেড়ে হেলেদুলে সুগন্ধী বস্তুটার চারিদিকে ঘুরতে লাগলো।

দূরে আরো দু' একটা কাছিম মুখ বাড়িয়ে ভাসছে। হিজল ফুলগুলি জলে এদিক-ওদিক ভেসে যাচ্ছে। ফুলগুলির সঙ্গে মনটা পিছনে চলে গেল। রথের মেলায় আমরা সকলেই গেছি। ঘুরে ঘুরে তিনজনেই রথ দেখেছি। পাঁপর ভাজা, চানাচুর, পিঁয়াজ-বড়া কিনছি—খাচ্ছি। পিঙ্গলি বেলুন ও মাটির পুতুল কিনল—লটারি খেললো, কিছুই পেল না।

রথ দেখার পর নৌকায় এসে পাটাতনের নীচ থেকে পিঙ্গলি একটা কাঠের পুতুল বের করে ছেন্টুকে দিল। তাই দেখে রাগে শরীর কাঁপছিল, না বলে পারলাম না, বললাম ঃ এটাও কি মেলায় কিনছিস।

পিঙ্গলি কটমট করে আমার দিকে তাকাল। যেন গিলে ফেলবে। কোন কথা বললো না। গুম হয়ে রইল। ছেন্টু বলল ঃ হ।

ঃ একটাই নাহি।

ঃ ওটাই তু নে।

ঃ তরটা নিতে যামু ক্যান।

ছেণ্টু আর কোন কথা না বলে পাটক্ষেতের মধ্যে দিয়ে নৌকা ঠেলে খালে ভাসাল।

এক দৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। খুব বড় একটা মাছ বা কাছিম চোখে পড়লো না। ছোট ছোট কাছিম ঘুরতে লাগলো। পিঙ্গলিদের বাড়ীতে ঢেঁকির শব্দ শোনা যাচ্ছে। চিড়া না ধান—কোনটা কে জানে। ওদের বাড়ীর ঢেঁকিটা ভাল যার জন্য মা প্রায়ই ওখানে যায়। সময় সময় মাকে সাহায্য করে বাড়া বেনে দেবার জন্য এগিয়ে আসে ও। আমাকে পছন্দ না করলেও মার সঙ্গে ভীষণ ভাব।

চি-চি করে একটা চিল ডেকে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট মাছগুলি এদিক ওদিক চলে গেল—একদম ফাঁকা। না, আজকে আর কিছু পাওয়া যাবে না, দিনটাই মাটি হয়ে গেল। একটা না একটা আপদ এসে জুটছে—নিরিবিলিতে যে একটু বস্‌বো তার আর জো নেই।

তিন নাথের মেলা।

ঘরের মধ্যে কিছু লোক বসেছে। মাঝখানে জলচৌকির আসন পাতা এবং সেখানে সাজানো ফুল বেলপাতার ঘট। ধূপের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি। পালাগান হচ্ছে। সবাই গায়ক। সকলের মাথা নড়ছে। গাঁজার কলকে হাত থেকে হাতে ঘুরছে! করতাল আর খোলের শব্দে শুচিশুদ্ধ পরিবেশ। একপাশে মেয়েরা বসেছে। সকলে গাইছে—এক পয়সাতে হয়—যার মেলা—কলিতে তিন নাথের মেলা। মেলায় লাগছে ধুম—পড়ছে ধূম। বোভম্ বোভম্ ভোমবলা। কলিতে তিন নাথের মেলা। পিঙ্গলি ধুনচিতে ধূপ দিচ্ছে।

হামাগুড়ি দিয়ে ওর গা ঘেঁসে বসলাম। পুরুষ আর মেয়েদের মাঝ বরাবর বসাতে সুবিধে হয়েছিল। পিঙ্গলি মাথা নাড়ছে। গায়ে গা লাগছে, ভাল লাগছে—ভয় লাগছে। কি জানি কি বলে। চড়া

মেজাজ ! বলছে ঃ বোভম্ বোম ভোমবলা। গাঁজায় লাগছে ধুম—পড়ছে ধুম। কলিতে তিন নাথের মেলা। গায়ে গা লাগছে। মনে দোলা লাগছে। পিঙ্গলি দুলছে—বোভম বোভম্ ভোমবলা। তাল দিচ্ছে। করতাল বাজছে, ঝিকির······ঝিকির······ঝিকির। শরীর কাঁপছে। পিঙ্গলি চোখ বুঁজে দুলছে। মাথা নাড়ছে। হাতে তাল ঠুকছে। এলরে তিনাথ ঠাকুর জগতে। আজ কি তামাসা হল কলিতে। ভাল লাগছে। পিঙ্গলির শরীর আমার উপর ঢলে পড়ল, ঢলানি। সর্বনাশী। বোভম বোভম ভোমবলা। ঘুম ঘুম চোখে টলছে, পড়ে গেল। চীৎকার শোনা গেল ঃ ভারে পরেছে। পিঙ্গলির হাত-পা থর থর করে কাঁপছে। ছটফট করচে, চুলগুলি ঝুলে পড়েছে। অদ্ভুত ভাল লাগছে। বোভম······বোভম······বোভম ভোমবলা। কলিতে তিন নাথের মেলা, উলুধ্বনি পড়ল। উল···উলু···উলুধ্বনি ঘরে প্রতিধ্বনিত হল। বহুদিনের আকাঙ্খা সফল হচ্ছিল। পিঙ্গলির কাছে বসবো—ওকে দু'হাতে ধরবো কিন্তু ধরেও ধরতে পারলাম না। সাধের কাছিমটা গভীর জলে তলিয়ে গেল। পিঙ্গলিকে নিয়ে রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে গেল। বাজনাও আরো জোরে বাজতে লাগল। বোভম—বোভম—ভোমবলা।

প্প্ ইসরে।

কত বড় কাছিম—ইস্।

জলের দিকে চোখ পড়ল। গজার, শোল, বোয়াল কাছিম। তারমধ্যে চারির মত বিরাট একটা কাছিম। জল কেটে—জল কেটে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৈঠার মত পা দিয়ে জল কাটছে। কুইচার মত লম্বা মুখ। যে ভাবেই হোক জায়গা মত কোপ মারতে পারলে পিঙ্গলি নিশ্চয়ই খুশী হবে। ছেন্টু নিশ্চয়ই এতবড় কাছিম মারতে পারেনি। বাপ্প্ ইসরে ! কত বড় কাছিম। টেঁটা তুলেছি, মারবো। এমন সময় ঝপ···ঝপ···ছপ···ছপ শব্দ করে বৈঠা ফেলে বিশু পাটনি বড় পুকুরে পড়ল।

আর তারি শব্দে সব কোথায় পালিয়ে গেল, হারিয়ে গেল।

হালার পো হালা। আহনের সময় পালি না। শত্তুর! বিশু পাটনী বেনীদার বৌকে নিয়ে এল। বৌদি ছইয়ের নীচে বসে রয়েছে। জলভরা চোখ—থমথমে মুখ। ধানক্ষেত। বাড়ীঘর জল নতুন চোখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখছে। বাপের বাড়ীর সুখস্মৃতি পিছনে রেখে দীর্ঘদিন পর ফিরলো। সেই ফাল্গুন মাসে গিয়েছিল। বেশ স্বাস্থ্য হয়েছে। এখানে থাকলেই বৌদির শরীর খারাপ হয়ে যায়—সংসারের সমস্ত কিছু এক হাতে তো করতে হয়। একটুও বিশ্রাম নেই। দেখতে বিশ্রী লাগে চেনা যায় না।

ভরদুপুর বেলা। রোদে তেমন তাত নেই। দুই একটা সাদা বক হিজল গাছে বসছে, মানুষের শব্দ পেয়ে আবার উড়ে পিঙ্গলীদের বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। ওদের বেতবনে অনেক বকের বাসা। একবার গুলতি নিয়ে গেলে হয়—দুই একটা মারা যেতে পারে।

কানামাছি খেলার সময় হয়ে এল। ছেন্টু, পিঙ্গলি নিশ্চয়ই উঠনে খেলতে নেমেছে। কানামাছি ভোঁ ভোঁ—যারে পাবি তারে ছোঁ। দেখতে পাচ্ছি ওরা খেলতে নেমেছে খেলুক। সখের কাছিমটা না মেরে গাছ থেকে নামছি না, মারবোই। পিঙ্গলি ছায়া-ছায়া আলোয় খেলতে নেমেছে, নামুক। কাছিমটা মারবো, তবে যাবো। ছেন্টু অসমতল উঠনে খেলতে নেমেছে, নামুক। কাছিমটা না নিয়ে ফিরছি না।